4796

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নূতনঘোষিত Circular No Sy 11/79/16
আগস্ট ২৯শে ১৯৭৯ পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত ও পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত।
[ Vide T. B. No. H/VII 81/74 Dated 8.1.81. ]

# সভ্যতার ইতিহাস

( মধ্যযুগ )

[ সপ্তম শ্রেণীর অবশ্য পাঠ্য ]

অধ্যাপক নলিনী রায়, এম. এ., বি. টি.
পি. জি. বি. টি. কলেজ, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া,
চব্বিশ পরগনা।

Rs 11 00

: প্রাপ্তিস্থান :
মিডল্যাণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী
১৯৬/এ বিধান সরণী,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশক :
শ্রীঅজিতকুমার সিংহ
১০, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম সংস্করণ : আগস্ট, ১৯৮০
সংশোধিত ও
পরিমার্জিত সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮১
তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৮২
চতুর্থ সংস্করণ : ১৯৮৩
সংশোধিত ও পরিমার্জিত
পঞ্চম সংস্করণ : ১৯৮৪



[ S. L. C. Paper used for printing of this book made available by the Government of India at a Concessional Rate. ]

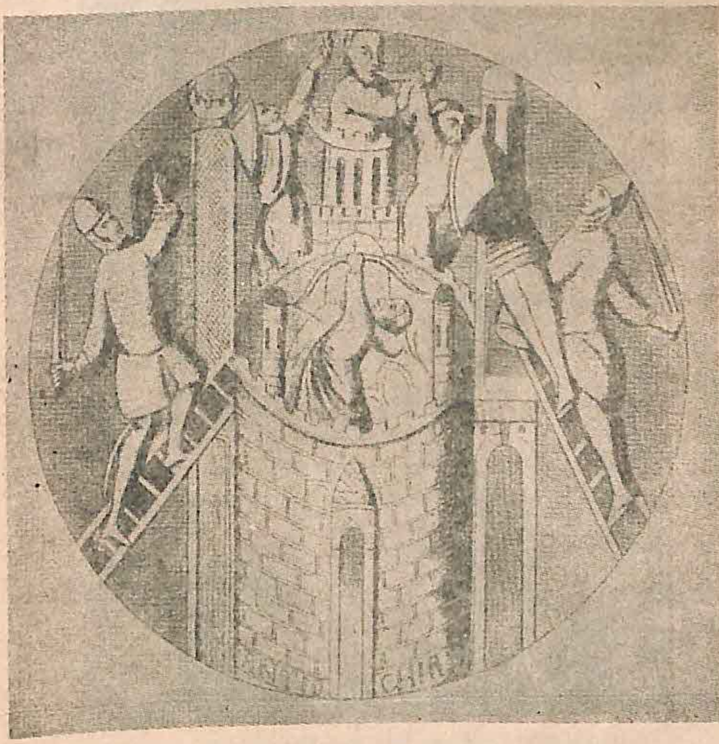
মূল্য : আট টাকা পঁচাত্তর পয়সা মাত্র।

মুদ্রাকর :
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিন্টার্স,
৬, শিবু বিশ্বাস লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

# সূচীপত্র

## প্রথম অধ্যায় | মধ্যযুগ

ইতহাসের কোন সময়কে 'মধ্যযুগ' বলা হয়? কখন 'মধ্যযুগের' শুরু? কবে 'মধ্যযুগের' অবসান? পৃথিবীর সব দেশেই কি 'মধ্যযুগ' একই সময়ে আরম্ভ হয়েছিল? 'মধ্যযুগের' সমাজ ও অর্থনীতির



ক্রুসেডের একটি দৃশ্য
( দ্বাদশ শতাব্দীর চিত্র )

বৈশিষ্ট্য কি? 'মধ্যযুগের' ইতিহাস জানতে হলে এ-সব প্রশ্নের উত্তর আমাদের আগে জেনে নিতে হবে।

চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে দু'ভাগ হয়ে যায়। পূর্ব দিকের রোমান সামাজ্য বাইজানটিয়াম-এর

রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল। বিভক্ত রোমান সাম্রাজ্যের অপর ভাগ ছিল পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য। রোম ছিল পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী।



মুক্তিদাতা
শিল্পী : আঁদেই রুবলেভ

(ক) ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের শেষ রোমান সম্রাট রোমুলাস সিংহাসনচ্যুত হন। নানা বর্বর জাতির আক্রমণ, অভ্যন্তরীণ বিবাদ, দাস বিদ্রোহ, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব ইত্যাদির ফলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। মধ্য এশিয়ার হূনরা ইউরোপ অভিযান করে। বর্বর জার্মান জাতিগোষ্ঠীগুলি

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে।

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতন হয়। ঐ বৎসর তুর্কীরা বাইজানটিয়াম-এর রাজধানী কনস্টান্টিনোপল অধিকার করে।

কনস্টান্টিনোপল-এর পতনের পর দেড়শ-দুশ বছরের মধ্যে ইউরোপ মহাদেশে নূতন সমাজ, নূতন রাষ্ট্র, নূতন শিক্ষা, নূতন অর্থনীতি গড়ে ওঠে। এই নূতন সমাজের নাম বুর্জোয়া সমাজ।

ইউরোপে মধ্যযুগ

ইউরোপে হল্যাণ্ড হল প্রথম রাষ্ট্র যেখানে বুর্জোয়া বিপ্লব সার্থক হয়েছিল। কারখানা স্থাপনের ফলে বুর্জোয়া অর্থনীতিতে উৎপাদন বেড়ে গেল। শ্রমিক শোষিত হলেও বুর্জোয়া সমাজে তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বৃদ্ধি পেল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ চর্চার ফলে বুর্জোয়া সমাজে আবির্ভূত হল মানবতাবাদী লেখক ও শিল্পীর দল। মানবতাবাদীরা ঈশ্বর ও গির্জার পরিবর্তে মানুষের জয়গান গাইলেন। তাঁরা ভুলে-যাওয়া প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সমাজের সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদির চর্চাও আরম্ভ করলেন। মানবতাবাদীরা নিজেদের সময়কে বললেন রেনেসাঁস বা নবজাগরণ। তাঁরা প্রাচীন গ্রীক, রোমান সমাজের সমাপ্তি থেকে নবজাগরণ আরম্ভ হওয়ার মধ্যবর্তী কালকে 'মধ্যযুগ' বলে চিহ্নিত করলেন। সাধারণভাবে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন (৪৭৬ খ্রীঃ) থেকে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতন (১৪৫৩ খ্রীঃ) বা কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার (১৪৯২ খ্রীঃ) পর্যন্ত মোটামুটি এক হাজার বছরের ইতিহাসকে মধ্যযুগ বলা হয়।

সামন্ততন্ত্র মধ্যযুগের সমাজ ও অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। সামন্ততন্ত্রের পূর্ববর্তী প্রাচীন সমাজ ছিল ক্রীতদাসপ্রথার উপর নির্ভরশীল। মধ্যযুগে ক্রীতদাসপ্রথার অবসান হল। উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রীতদাসদের জায়গায় এল ভূমিদাস বা সার্ফ। ভূমিদাসরা জীবিকার জন্য জমিদার বা সামন্তপ্রভুর উপর নির্ভরশীল ছিল। তবে ক্রীতদাসদের মত তারা নিঃসম্বল ছিল না। তারা নিজেদের জন্য সামান্য কিছু জমি রাখতে

পারত। ক্রীতদাসদের অপেক্ষা-ভূমিদাসদের স্বাধীনতাও কিছু বেশী ছিল। মোটকথা সামন্ততন্ত্র আসার ফলে মধ্যযুগের সমাজ ক্রীতদাস প্রথার উপর নির্ভরশীল প্রাচীন সমাজের তুলনায় অনেকখানি এগিয়ে গেল।

(খ) ভারতে গুপ্তবংশের শেষ প্রভাবশালী গুপ্তসম্রাট ছিলেন স্কন্দগুপ্ত। তিনি পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করেছিলেন। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতের উপরও হূন আক্রমণ হয়েছিল। গুপ্তযুগের শেষভাগে ভারতে সামন্ততন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকেই ভারতে সামন্ততন্ত্রের সূত্রপাত হয়েছিল।

ভারতে মধ্যযুগ

সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইউরোপের মত ভারতেও প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী সামন্ত প্রভুদের আবির্ভাব হল। সামন্ত প্রভুদের অনেকেই বিরাট ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। কোনো কোনো সামন্তপ্রভু 'রাজা' উপাধি পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন। সামন্ততন্ত্রের অধীনে ভারতের কৃষকশ্রেণী শোষিত ও নির্যাতিত হতে থাকে। তার উপর জাতিভেদ ভারতীয় সমাজের শ্রেণীবিভাগ আরও স্পষ্ট করে তোলে। সপ্তম শতাব্দীতে ভারত বহু খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দেশে কেন্দ্রীয় শক্তির অভাব দেখা দেয়। শোষিত এবং নির্যাতিত মানুষ কখনই শোষক শ্রেণীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। কিন্তু সামন্ততন্ত্র ভারতীয় সমাজের সেই অনৈক্যই সৃষ্টি করেছিল। ফলে আফগানিস্থান থেকে সুলতান মামুদ বা মহম্মদ ঘোরি প্রভৃতি বৈদেশিক আক্রমণকারী যখন ভারত আক্রমণ করেছে ভারতীয় সমাজ তখন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে তুর্ক-আফগান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবর দিল্লীতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তুর্ক-আফগান এবং মুঘল শাসকরাও ভারতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রেখেছিল।

(গ) ইউরোপে পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্যযুগ আরম্ভ হয়। সামন্ততন্ত্র মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গুপ্তযুগের শেষভাগে ভারতে

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য দেখা দিতে থাকে। পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ এবং ভারতে মধ্যযুগ বিরাজিত ছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ে ইউরোপ এবং এশিয়া মহাদেশের মধ্যে একমাত্রযোগসূত্রছিলবাইজানটাইন সাম্রাজ্য। ভারতের সঙ্গেও বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক যোগ ছিল।

ইউরোপ এবং ভারত

(ঘ) মধ্যযুগের সময়-বিভাগ অবশ্য কোনো বাঁধাধরা নিয়ম মেনে করা যায় না। তার কারণ স্পষ্ট। হঠাৎ একটি দিন স্থির করে মধ্যযুগ আরম্ভ হয় নি। ক্রমে ক্রমে মধ্যযুগ এবং সামন্ততন্ত্র বিকাশ লাভ করেছে। কখনও আবার প্রাচীন যুগ মধ্যযুগে মিশে গিয়েছে।

সময় বিভাগ—বাঁধাধরা নয়

(ঙ) মধ্যযুগের সময় বিভাগ সব দেশে এক রকম নয়। ইউরোপ এবং ভারতে এই সময়কাল পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী। কিন্তু চীনে মধ্যযুগের সময়কাল হল সপ্তম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী। জাপানে পঞ্চম শতাব্দীতেই মধ্যযুগের সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু আরবে মধ্যযুগ আরম্ভ হয় এর দু-শ বছর পর।

নানা দেশে—নানা সময়ে

(চ) মধ্যযুগে বিভিন্ন দেশে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঠিক একই রকম হয় নি। কোথাও বিকাশের ধারা ছিল খুব দ্রুত, কোথাও শ্লথ। বিভিন্ন দেশের সমাজের গঠনেও নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। মধ্যযুগের মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব ছিল খুব বেশী। ইউরোপে ধর্মের নামে খ্রীষ্টান এবং মুসলমানগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছে। ভারতে কিন্তু কবীর, নানক, চৈতন্যদেব প্রভৃতি ধর্মসংস্কারকগণ হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বাণী প্রচার করেছিলেন।

বিভিন্ন ধরন

## অনুশীলনী (১)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের শেষ রোমান সম্রাট কে? (২) কত খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়? (৩) বাইজানটিয়াম কি?

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ** শূন্যস্থান পূরণ কর (১) ———খ্রীষ্টাব্দে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতন হয়। (২) তুর্কীরা বাইজানটিয়াম-এর রাজধানী——— অধিকার করে।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) কীভাবে ইউরোপের মধ্যযুগ আরম্ভ হল? (২) ইউরোপের মধ্যযুগের সময়কাল বর্ণনা কর। (৩) মধ্যযুগের সমাজ ও অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** ইউরোপের মধ্যযুগের বিবরণ দাও।

## অনুশীলনী (২)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) ভারতে শেষ প্রভাবশালী গুপ্তসম্রাট কে? (২) কোন্ সময় ভারতে সামন্ততন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) ভারতে মধ্যযুগের সময়কাল আলোচনা কর। (১) কেন মধ্যযুগে ভারত বৈদেশিক আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে নি?

## অনুশীলনী (৩)

**আলোচনা কর ঃ** (১) ইউরোপ এবং ভারতের মধ্যযুগ। (২) বাঁধাধরা নিয়ম মেনে মধ্যযুগের সময়-বিভাগ করা যায় না কেন? (৩) ইউরোপ, ভারত, চীন, জাপান এবং আরবে কোন্ কোন্ শতাব্দীতে মধ্যযুগ আরম্ভ হয়েছিল? (৪) মধ্যযুগে ইউরোপ এবং ভারতে ধর্মের প্রভাব ও পরিণতির বৈশিষ্ট্য।

গ্রীকরা নিজেদের সভ্যতা নিয়ে খুব গর্বিত ছিল। তারা যাদের ভাষা বুঝত না তাদের 'বার্বারোস' বলত। 'বার্বারোস' অর্থ বর্বর। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যে গ্রীক ভাষা বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিল। রোমান সাম্রাজ্যের বাইরে জার্মান ভাষাভাষী বিভিন্ন জার্মান উপজাতি বাস করত। এইসব জার্মান উপজাতিদের মধ্যে ছিল অস্ট্রোগথ বা পূর্বদিকের গথ, ভিসিগথ বা পশ্চিমদিকের গথ, ফ্রাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল, এ্যাঙ্গেল, স্যাকসন ইত্যাদি। জার্মান উপজাতিগুলি বর্বর নামে পরিচিত ছিল।

(ক) চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই জার্মান উপজাতিগুলি পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে থাকে। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে সম্পূর্ণ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য বর্বর জার্মান উপজাতিগুলির অধিকার-ভুক্ত হয়। বর্তমান ফ্রান্স দেশকে রোমানরা গল বলত। ফ্রাঙ্করা গল অধিকার করে। ফ্রাঙ্ক থেকেই ফ্রান্স নামটি এসেছে। স্পেন ভিসিগথদের অধিকারভুক্ত হয়। ভ্যাণ্ডালরা উত্তর আফ্রিকা দখল করে। ব্রিটেন এ্যাঙ্গেল এবং স্যাক্সনদের অধিকারে আসে।

প্রশ্ন হতে পারে জার্মান উপজাতিগুলি কেন নিজ বাসভূমি ছেড়ে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হল?

**হূন আক্রমণ**

এর কারণ হল হূন আক্রমণ। হূনরা ছিল মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতি। হূনরা চীন বিধ্বস্ত করে, রাশিয়ার ভলগা নদী অতিক্রম করে মধ্য ইউরোপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। চতুর্থ শতাব্দীতে গথনেতা জার্মানেরিকস-এর নেতৃত্বাধীনে সম্মিলিত জার্মান উপজাতিগুলি হূনদের নিকট পরাভূত হয়। বিজয়ী ও দুর্ধর্ষ হূনদের চাপে গথ এবং মধ্য ইউরোপের

অন্যান্য জার্মান উপজাতিগুলি নিজেদের বাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পঞ্চম শতাব্দীতে হূন জাতির একটি শাখা ভারত আক্রমণ করে। কিন্তু গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্ত সেই আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন।

নিজ বাসভূমি ত্যাগের পর জার্মান উপজাতিগুলি নতুন জমি ও আশ্রয়ের সন্ধানে রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ আক্রমণ ও দখল করতে থাকে। রোমান সম্রাটদের দুর্বলতা অভ্যন্তরীণ বিবাদ, করভারে জর্জরিত প্রজাদের বিক্ষোভ, ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ ইত্যাদির ফলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ক্রমশই ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে স্পেন এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সে সর্বপ্রথম জার্মান উপজাতিদের রাজ্য গঠিত হয় (৪১৯ খ্রীঃ)। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হল। ইতালির জার্মান সেনাবাহিনীর সৈনাধ্যক্ষ ওডোয়েসার পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের শেষ রোমান সম্রাট রোমুলাসকে সিংহাসনচ্যুত করলেন।

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হল। পূর্বদিকের রোম সাম্রাজ্য বা বাইজানটিয়াম কিন্তু দীর্ঘকাল টিকে ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্য বিশাল হয়ে উঠেছিল। তখনকার দিনে বিশ্বরাষ্ট্র বলতে রোমান সাম্রাজ্যকেই বোঝাত। দ্বিতীয় শতাব্দীতে উত্তরে স্কটল্যাণ্ড থেকে দক্ষিণে নীলনদ এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল থেকে পূর্ব দিকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল অঞ্চল রোমান আইন অনুসারেই শাসিত হত। তাছাড়া দীর্ঘকাল রোমান শাসনাধীনে থাকার ফলে রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি ঐক্যবোধ জেগে উঠেছিল। রোমান নামটিও এক ধরনের শ্রদ্ধা ও মর্যাদা বহন করত। রোমুলাসকে সিংহাসনচ্যুত করলেও জার্মান সৈনাধ্যক্ষ ওডোয়েসার সম্রাট হলেন না। তিনি বাইজানটিয়াম-এর রোমান সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য শাসন

কীভাবে রোমান আইন ও ঐক্য টিকে ছিল

করতে থাকলেন। ওডোয়েসার রোমান শাসননীতি অনুসরণ করে উচ্চ পদে রোমান সেনেট বা প্রতিনিধি সভার সদস্য নিয়োগ করেছিলেন। পরবর্তী কালে জার্মান উপজাতি ফ্রাঙ্কদের রাজা শার্লামেন রোমের সম্রাটরূপে ঘোষিত হয়েছিলেন ( ৮০০ খ্রীঃ )। খ্রীষ্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ স্বয়ং শার্লামেন-এর মস্তকে রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন। খ্রীষ্টধর্মও রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্যবোধ এনে দিতে সাহায্য করেছিল। রোমানদের মত জার্মান শাসকরা রোমান আইন অনুসরণ করত। ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাইজানটিয়ান-এর রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ান রোমান আইন সংকলন করেছিলেন। সর্বোপরি দীর্ঘকালের রোমান শাসন ও সভ্যতার প্রভাব সহজে মুছে দেওয়া জার্মান উপজাতিদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

(খ) রোম সাম্রাজ্যের পতনের পিছনে এ্যালারিক, এ্যাটিলা এবং গেইসেরিক-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

এ্যালারিক

এ্যালারিক ছিলেন ভিসিগথদের নেতা। চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে হূন অভিযানের ফলে বিপর্যস্ত হয়ে কিছু ভিসিগথ বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে এবং বর্তমান বুলগারিয়াতে বসতি স্থাপন করে। বাইজানটিয়ামেও ভিসিগথরা অত্যাচারিত হতে থাকে। বাইজানটাইন শাসনের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা বিদ্রোহ করে। বাইজানটিয়াম কর্তৃপক্ষ ভিসিগথদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাদের সাম্রাজ্যের পশ্চিম দিকে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়। এ্যালারিক কিছুকাল বাইজানটাইন শাসনের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ভিসিগথরা এ্যালারিক-এর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। এ্যালারিক রোম অভিযান করেন ( ৪১০ খ্রীঃ )। দক্ষিণ ইতালী অভিযানের সময় এ্যালারিক-এর মৃত্যু হয়।

বাইজানটিয়াম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে এ্যালারিক-এর বংশধরগণ গারোন নদী এবং পেরেনীজ পর্বতমালার মধ্যবর্তী স্থানে বসতি স্থাপন করে। সেখান থেকে তারা স্পেন এবং

দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্স অধিকার করে। এভাবে প্রথম বর্বর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ( ৪১৯ খ্রীঃ )।

এ্যাটিলা ছিলেন দুর্ধর্ষ হূন নেতা। পঞ্চম শতাব্দীতে এ্যাটিলা হূন এবং জার্মান উপজাতিদের দ্বারা গঠিত বাহিনীর সাহায্যে বলকান অঞ্চল অভিযান করেন। বাইজানটাইম সাম্রাজ্য এ্যাটিলার আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। বাইজানটাইন সম্রাট প্রচুর অর্থ দিয়ে এ্যাটিলাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। অতঃপর এ্যাটিলা পশ্চিমদিকে অভিযান করেন। উত্তর ইতালীর বহু শহর এ্যাটিলার আক্রমণের ফলে ধ্বংস হয়। ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এ্যাটিলার মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। হূনরা স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মিশে যায়।

এ্যাটিলা

গেইসেরিক উত্তর আফ্রিকায় ভ্যাণ্ডালদের রাজা ছিলেন। তিনি কার্থেজ জয় করেন এবং সিসিলি অভিযান করেন। গেইসেরিক রোম আক্রমণ করে রোম নগরীর প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিলেন। গেইসেরিক-এর নেতৃত্বে ভূমধ্যসাগরের উপর ভ্যাণ্ডালদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব এবং পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেইসেরিক-এর আধিপত্য শেষ করার চেষ্টা করে। ঐক্যবদ্ধ রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে জলযুদ্ধে গেইসেরিক জয়ী হন ( ৪৬৮ খ্রীঃ )। গেইসেরিক-এর মৃত্যুর পর বাইজানটিয়াম শক্তি উত্তর আফ্রিকার ভ্যাণ্ডালদের ধ্বংস করে।

গেইসেরিক

**দেশত্যাগী বর্বর জাতিদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবন :**

হূন অভিযানের ফলে বর্বর জার্মান উপজাতিরা পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে তারা নূতন নূতন রাজ্যও গড়ে তোলে। ভ্যাণ্ডালরা উত্তর আফ্রিকায় রাজ্য গড়ে। এ্যাঙ্গেল, স্যাক্সন ইত্যাদি উপজাতিরা ইংলণ্ডে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করে। ক্লোভিস-এর নেতৃত্বে গেলে ফ্রাঙ্কদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ( ৪৮৬ খ্রীঃ )। রোমান সেনাবাহিনী ফ্রাঙ্ক থেকে বিতাড়িত হয়। ক্লোভিস ফ্রাঙ্কদের

রাজা হন। রাজা থিওডোরিক-এর নেতৃত্বে অস্ট্রোগথরা ইতালী জয় করে (৪৯৩ খ্রীঃ)। রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ, রাজ্যস্থাপন ও বসতি স্থাপনের ফলে জার্মান উপজাতিদের সঙ্গে রোমানদের মেলামেশা আরম্ভ হয়। ক্রমে ক্রমে জার্মান উপজাতি এবং রোমানরা মিলে যেতে থাকে। এমন কি, মধ্য এশিয়ার যাযাবর হূনরা পর্যন্ত পূর্ব ইউরোপের জনগণের মধ্যে মিলে গিয়েছিল। দেশত্যাগের পূর্বে জার্মান উপজাতিদের জীবনযাত্রা ছিল একরকম। রোমানদের সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় জীব'নর পরিবর্তন হয়।

বসতি স্থাপন—মিশ্রণ

জার্মানরা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করত। তাদের সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক। এক ধরনের সমতা জার্মান উপজাতিদের সমাজে ছিল। এক একটি গোষ্ঠীর সকলেই একসঙ্গে চাষবাস করত। ফসল যা হত তা সকলেই একসঙ্গে ভোগ করত। জার্মান সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি খুব বেশী ছিল না। কিন্তু রোমানদের সংস্পর্শে আসার পর জার্মানদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রচলন হতে থাকে। গোষ্ঠীগুলি ক্রমে ক্রমে ভেঙে যায়। গোষ্ঠীর পরিবর্তে পরিবার জমির মালিক হয়। জার্মান সমাজের যারা সামরিক নেতা তারা অন্যের চেয়ে অনেক বেশী জমি নিজেদের ভাগে নিয়ে নেয়। সমাজের প্রধান ব্যক্তি ও সামরিক নেতারা রোমান অভিজাতদের জমিও দখল করে জমিদার এবং ভূস্বামী হতে থাকে। রোমান সমাজে শ্রেণীবিভাগ ছিল। রোমানদের সংস্পর্শে এসে জার্মান সমাজেও শ্রেণীবিভাগ দেখা দেয়। জার্মান সমাজের সমতার ভাব নষ্ট হয়।

সামাজিক জীবন

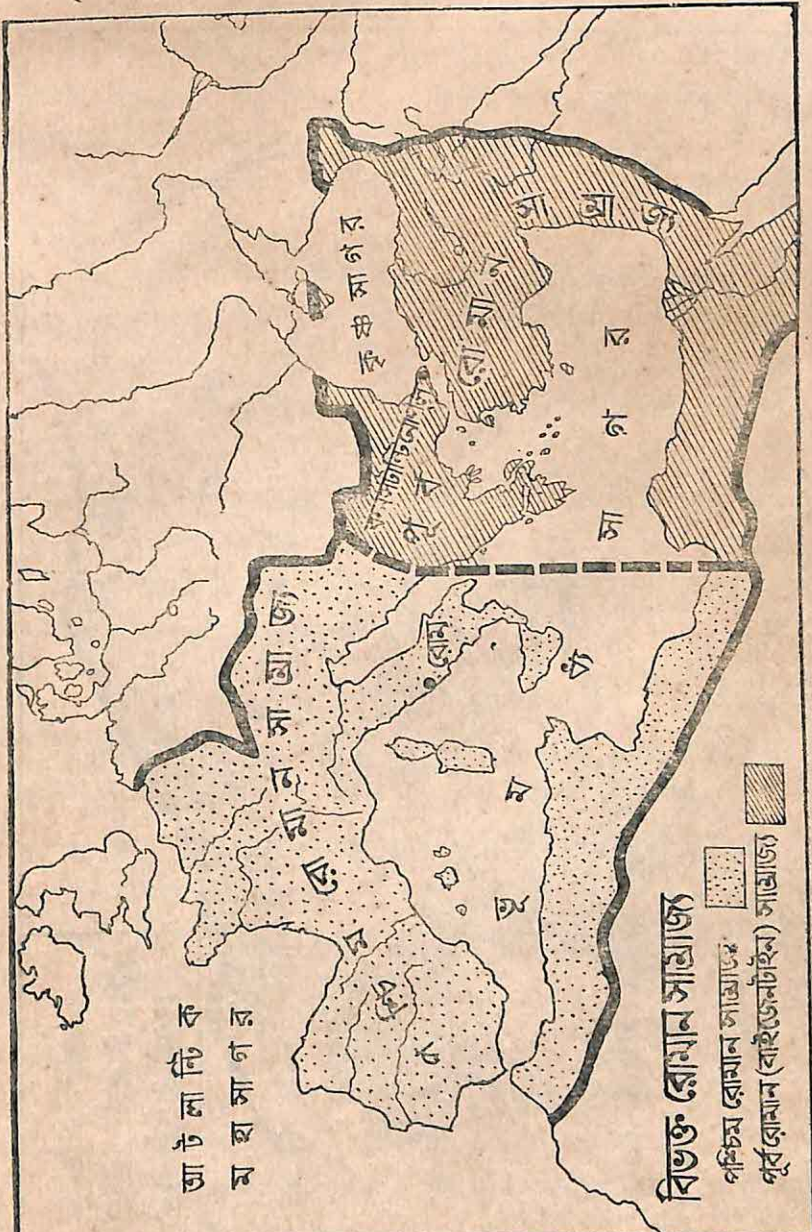
দেশত্যাগের পূর্বে জার্মান সমাজে রাজপদ ছিল না। গোষ্ঠীগুলি সামরিক নেতাদের কর্তৃত্ব মেনে চলত। সামরিক নেতার পদ বংশানুক্রমিক ছিল না। পিতা সামরিক নেতা হলে পুত্রও যে সামরিক নেতা হবে এমন না-ও হতে পারে। সামরিক নেতাকে নিজ যোগ্যতার পরিচয় দিতে হয়। রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বসতি স্থাপনের পর জার্মানরাও রোমান রাজনৈতিক আদর্শ অনুসরণ করে রাজা হতে থাকে।

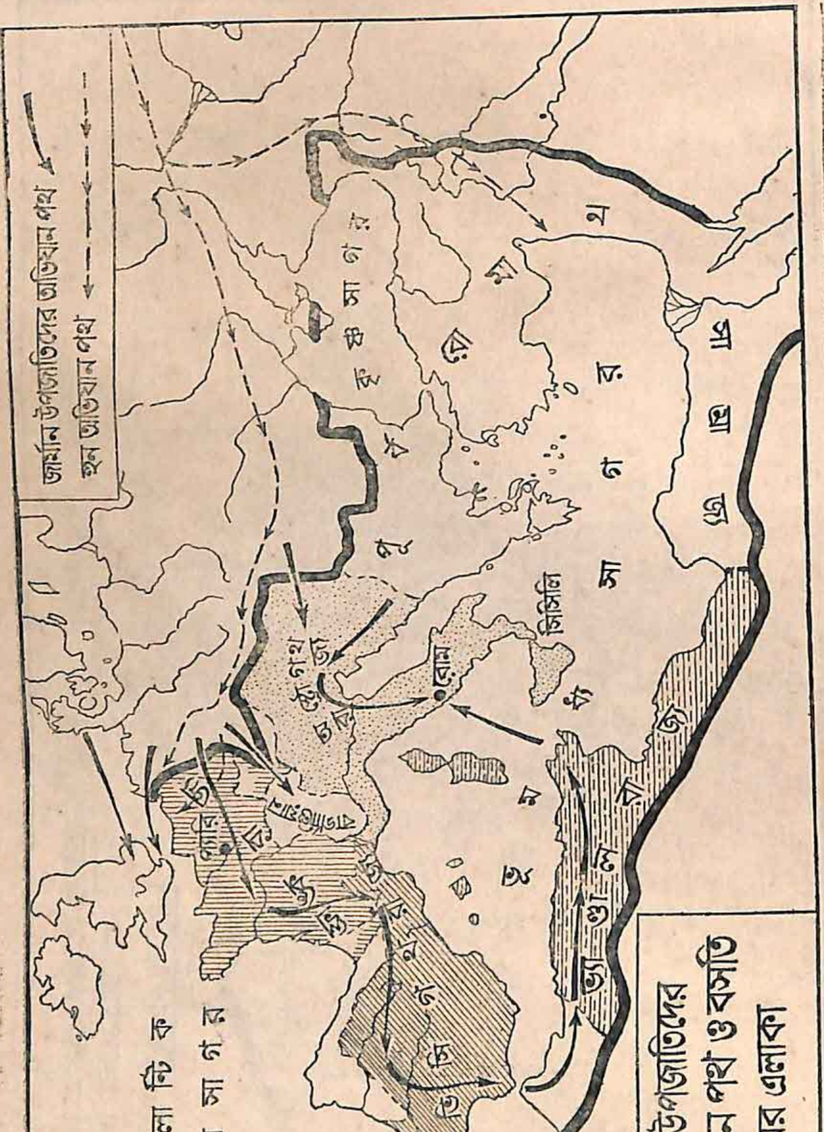
রাজনৈতিক জীবন

রাজপদ বংশানুক্রমিক। রোমানদের সংস্পর্শে আসার পর জার্মানদের মধ্যেও বংশানুক্রমিক রাজশাসন আরম্ভ হয়। পূর্বে জার্মান সমাজে কোনো বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিলে জনসাধারণের সমিতিগুলি সে-সব মিটিয়ে দিত। কিন্তু রাজশাসন প্রচলিত হওয়ার পর জার্মান রাজারা সমিতিকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র অভিজাতদের পরামর্শ নিয়ে রাজ্য চালাত। অভিজাত ও ধনী ব্যক্তিরা সমাজ শাসন করত। অতএব রোমানদের সংস্পর্শে আসার পর জার্মানদের রাজনৈতিক জীবনেও অসাম্য আসে।

ধর্মীয় জীবন

প্রাচীন জার্মান ধর্মে উঁচু-নিচু ভেদ ছিল না। সমাজে সমতার ভাব থাকার দরুন নিচু শ্রেণী উঁচু শ্রেণীর কথা মেনে চলবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। রোমান শাসনে খ্রীষ্টধর্ম রাজধর্মে পরিণত হয়েছিল। রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব ছিল অসীম। খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা ছিল যে কর্তৃপক্ষের আদেশ মেনে চলা উচিত। প্রজারা সর্বদা আদেশ মেনে চলবে—জার্মান রাজারাও তো তাই চায়! অতএব জার্মান শাসকরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করল এবং প্রজাদের খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করল। অপরপক্ষে আত্মার মুক্তি, ব্যক্তি স্বাধীনতা খ্রীষ্টধর্মের এইসব আদর্শের মধ্যে মুক্তির আশ্বাস লাভ করেছিল। ফলে তারা সহজেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল।


বিভক্ত রোমান সাম্রাজ্য
পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য
পূর্ব রোমান (বাইজেন্টাইন) সাম্রাজ্য
আটলান্টিক মহাসাগর
কৃষ্ণ সাগর
রোম


জার্মান উপজাতিদের অভিযান পথ
হুন অভিযান পথ
আটলান্টিক মহাসাগর
কৃষ্ণসাগর
রোম
সিসিলি
জার্মান উপজাতিদের অভিযান পথ ও বসতি স্থাপনের এলাকা

## অনুশীলনী (১)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) কারা বর্বর নামে পরিচিত ছিল? (২) তিনটি জার্মান উপজাতির নাম বল। (৩) রোমানরা বর্তমান ফ্রান্সকে কি বলত? (৪) মধ্য এশিয়ার কোন্ যাযাবর জাতি ইউরোপ আক্রমণ করে?

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ** সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন দাও। উত্তর ভুল থাকলে × চিহ্ন দেবে—

(ক) পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের শেষ রোমান সম্রাট ছিলেন ওডোয়েসার। (খ) পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলেও বাইজানটিয়াম দীর্ঘকাল টিকে ছিল।

(গ) ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কদের রাজা শার্লামেন রোমের সম্রাটরূপে ঘোষিত হন।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) কেন জার্মান উপজাতিগুলি নিজ বাসভূমি ছেড়ে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য অধিকার করল? (২) পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কী? (৩) পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর কীভাবে রোমান আইন ও ঐক্যবোধ টিকে ছিল?

## অনুশীলনী (২)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) এ্যালারিক কে ছিলেন? (২) এ্যাটিলা কে? (৩) গেইসেরিক কে?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** পাঁচটি বাক্যে এ্যালারিক অথবা এ্যাটিলা অথবা গেইসেরিক-এর পরিচয় দাও।

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** রোম সাম্রাজ্যের পতনের পিছনে এ্যালারিক, এ্যাটিলা এবং গেইসেরিক এর অবদান আলোচনা কর।

## অনুশীলনী (৩)

**মানচিত্র বিষয়ক প্রশ্ন ঃ** ইউরোপের রেখ মানচিত্রে প্রদর্শন কর ঃ (ক) বর্বর জার্মান উপজাতিদের অভিযান পথ; (খ) রোম।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** বর্বর জার্মান উপজাতিদের রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় জীবন আলোচনা কর।

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** দেশত্যাগী বর্বর জা তদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবনের বর্ণনা দাও।

## তৃতীয় অধ্যায় | ইউরোপের "অন্ধকারময় যুগ"— একটি অবাস্তব ধারণা

কেউ কেউ বলেন যে, মধ্যযুগ ছিল ইউরোপের অন্ধকারময় যুগ। তাঁদের মতে এই যুগে ইউরোপে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলো নির্বাপিত ছিল। তাই তাঁরা মধ্যযুগকে অন্ধকারের যুগ বলেন।

ধারণাটি কিন্তু ভুল। মধ্যযুগের আরম্ভকালে, অর্থাৎ চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দীতে ইউরোপে জ্ঞানচর্চার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময় পশ্চিম ইউরোপ অপেক্ষা পূর্ব ইউরোপেই বেশি জ্ঞানচর্চা হত।

চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে যে সকল দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ক্যালসিডিয়াস, ম্যাক্রোবিয়াস, এম্পিরিকাস, প্রোক্লাস, ক্যাপেলা, ইসিডোর, স্টিফানাস, বীড, ক্যালিনিকাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ক্যালসিডিয়াস চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ল্যাটিন ভাষায় গ্রীক দার্শনিক প্লেটো কর্তৃক রচিত গ্রন্থের ভাষ্য প্রস্তুত করেন। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্লেটোর চিন্তাধারার সঙ্গে পণ্ডিত সমাজের পরিচয় এই ভাষ্যের মাধ্যমেই হয়েছিল। ম্যাক্রোবিয়াস (৩৯৫-৪২৩ খ্রীঃ) তাঁর গ্রন্থে জ্যোতিষ, ভূগোল, গণিত, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদির আলোচনা করেছেন। এম্পিরিকাস ছিলেন চিকিৎসক এবং ভেষজবিদ্। তাঁর বাসস্থান ছিল বর্দো। এম্পিরিকাস চতুর্থ শতাব্দীর শেষ থেকে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। প্রোক্লাস (৪১০-৪৮৫ খ্রীঃ) ছিলেন বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ এবং গাণিতিক। তিনি গ্রীক জ্যামিতিক ইউক্লিড-এর গ্রন্থের উপর টীকা রচনা করেছিলেন। প্রোক্লাস-এর গ্রন্থ থেকে গ্রীক জ্যামিতির ইতিহাস জানা যায়।

প্রোক্লাস তাঁর রচনায় সূর্যের বলয়গ্রাস, জলঘড়ির সাহায্যে সূর্যের ব্যাস নির্ধারণ পদ্ধতি ইত্যাদিরও উল্লেখ করেছেন। ক্যাপেলা পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধে গদ্য এবং পদ্যে বিশ্বকোষের মত একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি নয় ভাগে বিভক্ত। গ্রন্থটিতে সঙ্গীত, কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ভূগোল, জ্যামিতি, পাটীগণিত ইত্যাদির আলোচনা রয়েছে। ইসিডোর ( আনুমানিক ৫৬০-৬৩৬ খ্রীঃ ) স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন। ইসিডোর ছিলেন ধর্মযাজক। খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হলেও ইসিডোর-এর বিজ্ঞানপ্রীতি ছিল উল্লেখযোগ্য। **স্টিফানাস** ( ৬১০-৬৪১ খ্রীঃ ) ছিলেন চিকিৎসক। তিনি এথেন্স-এর অধিবাসী ছিলেন। **বীড** ছিলেন সপ্তম শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক। তিনি ইংরেজ ঐতিহাসিকদের জনকরূপে মর্যাদা লাভ করেছেন। **ক্যালিনিকাস** "গ্রীক আগুনের" আবিষ্কর্তারূপে কথিত হন। সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে আরবরা কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করলে বাইজানটিয়াম-এর সৈনিকরা "গ্রীক আগুন" নিক্ষেপ করে আরবদের জাহাজ ধ্বংস করে। "গ্রীক আগুন" জলের নিচেও কাজ করত।

বাইজানটাইন সাম্রাজ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য এত বিখ্যাত ছিল যে বুলগারিয়া, ইতালি ইত্যাদি ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল হতে বহু লোক গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা, রোমান আইনকানুন, শিল্প ও স্থাপত্য শিক্ষার জন্য বাইজানটাইনে আসত।

অতএব মধ্যযুগের আরম্ভকালকে ইউরোপের "অন্ধকারময় যুগ" বলা যায় না।

## মঠ ও শিক্ষা

খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিগণ মঠে বাস করতেন। তাছাড়া প্রায় প্রতি গ্রামেই একজন খ্রীষ্টান যাজক থাকতেন।

খ্রীষ্টান মঠগুলিতে বিদ্যাচর্চা হত। মধ্যযুগে মঠগুলি শিক্ষার ধারা প্রবাহিত রেখেছিল। এ সময় সরকারী কাজকর্ম ও শিক্ষার ভাষা ছিল ল্যাটিন। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর মঠের যাজকগণই সবচেয়ে বেশী ল্যাটিন ভাষার চর্চা করতেন।

মঠের শিক্ষা ছিল মূলত ধর্মীয় শিক্ষা। খ্রীষ্টানদের ধর্মশাস্ত্র বাইবেল। বাইবেল বিরোধী কোনো জ্ঞান বা বিজ্ঞান চিন্তা মঠে



একটি খ্রীষ্টীয় মঠ

স্থান পেত না। মঠের শিক্ষায় সাধুসন্তদের গৌরব কাহিনীই প্রচারিত হত। এই কাহিনীর মধ্যে অনেক অলৌকিক কথাও থাকত।

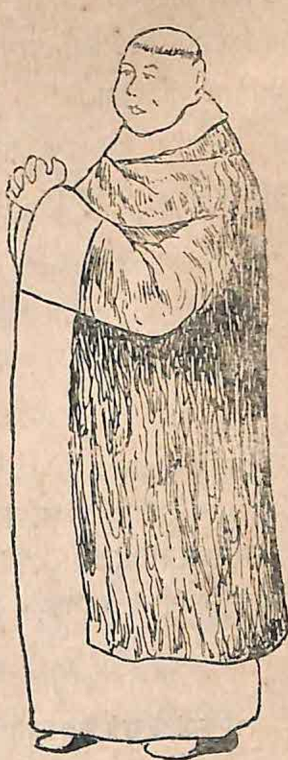
খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসের স্থান খুব বেশী। খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী সেণ্ট অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০ খ্রীঃ) গ্রীক দর্শনের উপর ভিত্তি করে খ্রীষ্টধর্মের পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আলোচনা করেন। ওরিগেন, বেসিল, হিপোলাইটস প্রভৃতি ধর্ম-যাজকগণ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, প্রাণিজগৎ এবং প্রকৃতির মধ্যে সম্বন্ধ আলোচনা করে এক ধরনের বিজ্ঞান রচনা করেন যাকে বলা হয় খ্রীষ্টীয় বিজ্ঞান। অবশ্য এই বিজ্ঞানও খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস দ্বারাই প্রভাবান্বিত ছিল।

## যাজকদের প্রভাব

মধ্যযুগের আরম্ভকালে গির্জার যাজকদের চিন্তা ও ভাবনা, বিশ্বাস, ন্যায়-অন্যায় ও ভালোমন্দ বোধ সমাজের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রভাবের ফলে সেকালের সভ্যতা, মানুষের আচার-আচরণ, শিক্ষা, রীতিনীতি, জীবনযাত্রা ইত্যাদি একটি বিশেষ রূপ নিয়েছিল।

সাধারণ মানুষ ছিল অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তারা যাজকদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করত। যাজকদের জীবনযাত্রা সাধারণ মানুষকে সহজেই প্রভাবান্বিত করত।

খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীরা নম্র ও বিনীত থাকার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতেন। তাঁরা তাঁদের উপরস্থ সন্ন্যাসীদের সর্বদা মান্য করার প্রতিজ্ঞাও নিতেন। তাছাড়া সন্ন্যাসীরা আহার ও পোষাক-পরিচ্ছদে বিলাসিতা করতেন না। অবশ্য এসব নিয়ম ছিল সাধারণ সন্ন্যাসীদের জন্য। যাঁরা উঁচু স্তরের যাজক, যেমন বিশপ বা পোপ, তাঁদের আহার-বিহার বা পোশাক-পরিচ্ছদে যথেষ্ট প্রাচুর্য ও জাঁকজমক ছিল। আসল কথা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শ্রেণীবিভাগ ঈশ্বরনির্ভর সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও এসে গিয়েছিল। সাধারণ সন্ন্যসীরা জনগণের কাছাকাছি থাকত। তাদের উপদেশের ফলে জনগণ শাসক ও সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে শিখেছিল। জনগণ ভাবত যে দারিদ্র্য, ধনীদের শাসন, সমাজের শ্রেণীবিভাগ সবকিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়।



খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী

যাজকরা জনসাধারণকে রাজাদেশ এবং সামন্ত প্রভুদের কথা মেনে চলার উপদেশ দিতেন। যাজকদের শিক্ষা ছিল যে, শাসকশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গির্জার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মতই অন্যায়। অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণ যাজকদের কথা অন্ধভাবে মেতে চলত। কারণ তারা বিশ্বাস করত যে সন্ন্যাসীদের প্রার্থনার ফলে তারা রোগব্যাধি থেকে মুক্ত হবে, তাদের শস্যহানি হবে না। অতএব সন্ন্যাসীদের কথা মেনে চলা উচিত।

সমাজের ধনী ব্যক্তিরাও যাজকদের আশ্রয় করে থাকত। রাজা, জমিদার ও অন্যান্য ধনীব্যক্তিরা বহু অত্যাচার করত, বিনা কারণে বহু লোকের সর্বনাশ করত। এজন্য তারা বিবেকের দংশনে ভুগত।

যাজকদের শিক্ষা অনুসারে ধনী ব্যক্তিরা জানত যে, অন্যায় কাজের জন্য তাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে শাস্তি পেতে হবে। তাই তারা আশা করত যে যাজকদের আশ্রয়ে থেকে তারা ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ করবে।

রোম, কার্থেজ, আলেকজান্দ্রিয়া এবং আন্টিওক-এর বিশপদের খুব প্রভাব ছিল। কার্থেজের একজন যাজক রোমের পোপের নিকট লিখেছিলেন যে যারা হত্যা ও মূর্তিপূজার মত অপরাধ করবে, তাদের যেন খ্রীষ্টধর্ম থেকে বহিষ্কার করা হয়। যাজকরা নীতিধর্ম মেনে চলার উপদেশ দিতেন। মিলানের বিশপ সেণ্ট আম্ব্রোজ নীতিধর্ম না মানার জন্য সম্রাট থিওডোসিয়াসকে খ্রীষ্টধর্ম সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কার করার দাবি তুলেছিলেন।

এভাবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের বিশ্বাস ও আচার-আচরণ যাজকদের ন্যায়-অন্যায় বোধ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল।

## অনুশীলনী (১)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) ক্যাসসিডিয়াস কে ছিলেন? (২) প্রোক্লাস কে? (৩) কাকে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের জনক বলা হয়?

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** কেউ কেউ বলেন যে, মধ্যযুগ ছিল ইউরোপের "অন্ধকারময় যুগ"—এ সম্পর্কে তোমার অভিমত বল।

## অনুশীলনী (২)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) মঠে সন্ন্যাসীরা কীভাবে বিদ্যাচর্চা করতেন? (২) খ্রীষ্টীয় মঠের শিক্ষা আলোচনা কর।

## অনুশীলনী (৩)

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** কীভাবে মধ্যযুগের মানুষের বিশ্বাস ও আচার-আচরণ যাজকদের ন্যায়-অন্যায় বোধ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল?

| চতুর্থ অধ্যায় | বাইজানটাইন সভ্যতা |
|---|---|

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলেও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের নাম ছিল বাইজানটিয়াম। বাইজানটিয়াম-এর সভ্যতা বাইজানটাইন সভ্যতা নামে পরিচিত। প্রাচীন গ্রীক উপনিবেশ বাইজানটিয়াম-এর নাম অনুসারে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের নামকরণ হয়েছিল। কারণ এই উপনিবেশের উপরই বাইজানটাইন সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। ঈজিপ্ট, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর এবং গ্রীস বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে গ্রীক এবং গ্রীক প্রভাবিত জনগণ ছাড়াও বহু উপজাতি বাস করত। বাইজানটিয়াম-এর প্রধান ভাষা ছিল গ্রীক। সপ্তম শতাব্দীতে গ্রীকভাষা বাইজানটিয়ামের সরকারী ভাষা হয়। বাইজানটিয়াম-এর অধিবাসীগণ অবশ্য নিজেদের রোমীয় বলত এবং নিজেদের সাম্রাজ্যকে বলত রোমের সাম্রাজ্য।

বাইজানটিয়াম

বাইজানটিয়াম-এর সম্রাট কনসটেনটাইন বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল প্রতিষ্ঠা করেন (৩৩০ খ্রীঃ)। কনসটেনটাইন নিজে এই রাজধানীর পরিকল্পনা করেছিলেন। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে নগরীটি নির্মিত হয়। সুন্দর এবং বিশাল অট্টালিকা বিলাসদ্রব্যের প্রাচুর্য, আরামদায়ক জীবনযাপনের ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য কনস্টান্টিনোপল বিখ্যাত হয়ে ওঠে। সম্রাট কনসটেনটাইন-এর নাম অনুসারে রাজধানীর নাম হয় কনস্টান্টিনোপল। কনস্টান্টিনোপল-এর গৌরবের কাছে রোমের খ্যাতি ম্লান হয়ে যায়। কনস্টান্টিনোপল নূতন রোম নামে পরিচিতি লাভ করে।

কনস্টান্টিনোপল প্রতিষ্ঠা

কনসটেনটাইন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করে রোমের সম্রাট হয়েছিলেন। তখন পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্য চূড়ান্তভাবে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য এবং পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য এই

দুভাগে বিভক্ত হয় নি। তবে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের দু'দিকে দু'জন শাসক রাজত্ব করতেন। কনসটেনটাইন পশ্চিম দিকের শাসকরূপে তাঁর রাজত্ব আরম্ভ করেছিলেন। পূর্বদিকের শাসক লিসিনাস ছিলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী।

৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে কনসটেনটাইন লিসিনাসকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। যুদ্ধজয়ের পর কনসটেনটাইন সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হন এবং বাইজানটিয়ামে তাঁর শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কনসটেনটাইন-এর মৃত্যু হয়। এই সময় ভারতে সম্রাট ছিলেন গুপ্ত-বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত।

কনসটেনটাইন খ্রীষ্টধর্মকে বাইজানটিয়াম-এর রাষ্ট্রধর্মরূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বলতেন যে. একদিন আকাশে তিনি খ্রীষ্টের ক্রশ চিহ্ন দেখেছিলেন। এই ক্রশচিহ্নের মধ্যে লেখা ছিল—ক্রশ চিহ্নিত পতাকার সাহায্যে তুমি যুদ্ধজয়ী হবে। সম্রাট কনসটেনটাইন-এর এই দাবি কতখানি সত্য বলা যায় না। তবে খ্রীষ্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্মরূপে প্রতিষ্ঠা করে কনসটেনটাইন শাসনকার্যে অনেকখানি সুবিধা লাভ করেছিলেন। খ্রীষ্টান চার্চ ছিল অত্যন্ত দৃঢ় সংগঠন। চার্চ-এর অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসীদের ভ্রাতৃত্ববোধও ছিল অসাধারণ। কনসটেনটাইন এই সংগঠিত শক্তির সাহায্য লাভ করলেন। ফলে রাজশক্তির সঙ্গে ধর্মীয় শক্তি মিলিত হল। সম্রাট এবং চার্চ-এর মধ্যে নূতন সম্পর্ক স্থাপিত হল। এই সম্পর্ক ধরে একদিকে শাসক শক্তি ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পেল—অন্যদিকে চার্চ রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ লাভ করল। পশ্চিম ইউরোপের সর্বোচ্চ খ্রীষ্টান ধর্মগুরুকে পোপ বলা হয়। পূর্ব ইউরোপের সর্বোচ্চ খ্রীষ্টান ধর্মগুরুকে বলা হয় প্যাট্রিয়ার্ক। সম্রাট প্যাট্রিয়ার্ক এবং চার্চকে প্রচুর জমি দিলেন। এই জমি ছিল করমুক্ত। চার্চ এবং যাজকগণ শোষণব্যবস্থা ও সামন্ততন্ত্রের সমর্থক ছিল। তার উপর শাসন মেনে চলা, শাসকদের অবাধ্য না হওয়াই ছিল খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা। অতএব খ্রীষ্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্মরূপে গ্রহণ করে কনসটেনটাইন-এর নানা দিক থেকেই সুবিধা হয়েছিল। চার্চও রাজশক্তির আশ্রয় পাওয়ার

রাষ্ট্রধর্মরূপে খ্রীষ্টধর্ম

আশায় নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য সম্রাট কনসটেনটাইন-এর নিকট আবেদন করেছিল। ৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে কনসটেনটাইন সমগ্র বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্মের অনুকূলে আইন জারি করেন।

## (খ) জাস্টিনিয়ান

সম্রাট জাস্টিনিয়ান-এর রাজত্বকাল ( ৫২৭-৫৬৫ খ্রীঃ ) বাইজানটাইন সাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়।

পশ্চিম ইউরোপে ক্রীতদাস প্রথার অবসান হলেও বাইজানটিয়ামে এই প্রথা বজায় ছিল। তবে পরিবর্তনের ঢেউ বাইজানটাইন সমাজেও এসে লেগেছিল। বাইজানটিয়াম ক্রমশ সামন্ততান্ত্রিক প্রথার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ক্রীতদাসের মালিকরাই জমিদার ও সামন্ত প্রভু হচ্ছিল। বাইজানটিয়াম-এর শাসন ছিল কঠোর কেন্দ্রীয় শাসন। জাস্টিনিয়ান এই শাসনব্যবস্থা আরও কঠোর করে তুললেন। তিনি একদিকে যেমন সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা খর্ব করলেন, অন্যদিকে আবার ক্রীতদাস, ভূমিদাস ও কৃষকদের উপর শোষণব্যবস্থা দৃঢ় করলেন। জাস্টিনিয়ান-এর শাসনব্যবস্থার ফলে সমাজের সর্ব স্তরে অসন্তোষ দেখা দেয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এইসব বিদ্রোহের মধ্যে রাজধানী ক ন স্টা ন্টি নো প ল-এর 'নিকা' বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। 'নিকা' অর্থ-জয় কর। কনস্টান্টিনোপল-এর বিদ্রোহীরা বিদ্রোহের সময় "নিকা" ধ্বনি দিত। জাস্টিনিয়ান নির্মমভাবে এইসব বিদ্রোহ দমন করেন।

বিদ্রোহ




জাস্টিনিয়ান

সম্রাট জাস্টিনিয়ান থিওডোরা নামে নিচু বংশের একজন নর্তকীকে বিবাহ করেছিলেন। থিওডোরা চিরদিন স্বামীর অনুগতা ছিলেন এবং একবার খুব বিপদ থেকে স্বামীর প্রাণরক্ষা করেছিলেন।

জাস্টিনিয়ান একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। সিংহাসনে আরোহণের পর বৎসরেই তাঁকে পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় ( ৫২৮ খ্রীঃ )। দীর্ঘকাল ধরে তিন বার তাঁকে পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধে নিয়োজিত থাকতে হয়। অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। জাস্টিনিয়ান-এর সেনাপতি বেলিসারিয়াস আফ্রিকার ভ্যাণ্ডাল শক্তি নির্মূল করেন। জাস্টিনিয়ান ইতালীর বিরুদ্ধেও অভিযান করেছিলেন। এ সময় ইতালী অস্ট্রোগথদের দ্বারা শাসিত হত। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরে বাইজানটিয়াম এবং অস্ট্রোগথ শাসিত ইতালীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। জাস্টিনিয়ান-এর অপর সেনাপতি নার্সেস শেষ পর্যন্ত ইতালী জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন বটে, তবে দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর ইতালী তখন রিক্ত ও জনশূন্য। জাস্টিনিয়ান স্পেনের উপরও তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং স্পেনের কয়েকটি শহর অধিকার করেছিলেন।

সাম্রাজ্য বিস্তার

জাস্টিনিয়ান-এর যুদ্ধ জয় ও সাম্রাজ্য বিস্তার অবশ্য বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি। ৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জাস্টিনিয়ান-এর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে বাইজানটিয়াম বহু অধিকৃত অঞ্চল হারায়। এমন কি বর্বর জাতিরা বাইজানটিয়ামও আক্রমণ করে। সপ্তম শতাব্দীতে আরবরা একদা বাইজানটিয়াম কর্তৃক শাসিত সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং ঈজিপ্ট অধিকার করে।

জাস্টিনিয়ান-এর শাসনকাল আইন সংস্কার ও আইন সংকলনের জন্য প্রসিদ্ধ। পরিষ্কারভাবে আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য জাস্টিনিয়ান একটি কমিশন গঠন করেন। ত্রিবোনিয়ান নামে একজন বিশিষ্ট ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ এই কমিশন-এর প্রধান ছিলেন। কমিশন দীর্ঘকাল

ধরে প্রচলিত রোমান আইনগুলি সংকলন করে কোডেক্স জাস্টিনিয়ান-আস প্রকাশ করে (৫২৯ খ্রীঃ)। জাস্টিনিয়ান নিজেও কিছু রোমান আইন সংকলন করেছিলেন। এই সব আইনের গুরুত্ব হল এই যে আজও ইউরোপে যে সকল আইন প্রচলিত, জাস্টিনিয়ান-এর সময়কার আইন সেইসব আইনের ভিত্তিস্বরূপ। জাস্টিনিয়ান-এর আইন সম্রাটকে অপ্রতিহত ক্ষমতা দিয়েছিল, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং চার্চ-এর অধিকার রক্ষা করেছিল এবং ক্রীতদাসদের যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল।

আইন সংস্কার ও সংকলন ; গুরুত্ব

সম্রাট জাস্টিনিয়ান স্থাপত্য, চিত্রাঙ্কন ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বহু শহর, স্নানাগার রাস্তা, সেতু, দুর্গ, প্রাসাদ ও গির্জা নির্মিত হয়। কনস্টান্টিনোপল-এর বিখ্যাত সেণ্ট সোফিয়ার গির্জাটি এই সময়েই নির্মিত হয়। পাঁচ বৎসর ধরে দশ হাজার লোক গির্জাটি নির্মাণ করে। দেওয়াল চিত্রনের প্রতিও জাস্টিনিয়ান-এর বিশেষ আগ্রহ ছিল। সম্রাটের আগ্রহে রঙীন মর্মর প্রস্তর, কাচ ইত্যাদির সাহায্যে প্রাসাদ ও গির্জার দেওয়াল সজ্জিত হত। বাইজানটাইন চিত্রনরীতি গ্রীক শিল্পরীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। এই সময় প্রাচীন গ্রীক কবিতার সমাদর হয়।

স্থাপত্য ও চিত্রন

## (গ) বাইজানটিয়াম—বাণিজ্য ও সংস্কৃতি কেন্দ্র

পূর্ব ইউরোপে বিশাল বাইজানটাইন সাম্রাজের অভ্যন্তরে বড় বড় শহর গড়ে উঠেছিল। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনসটান্টিনোপলকে বলা হত "নূতন রোম"। বসফোরাস প্রণালীর তীরে অবস্থিত কনসটান্টিনোপল, সিরিয়ার এ্যান্টিওক, ঈজিপ্টের আলেকজান্দ্রিয়া ইত্যাদি নগর বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে গুরুত্ব অর্জন করেছিল। এইসব নগর থেকে ব্যবসায়ীরা ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। মধ্যযুগের আরম্ভকালে ইউরোপ এবং এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপনে বাইজানটিয়াম-এর ভূমিকা বিশেষ

ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র

ভাবে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম ইউরোপের কারিগররা বাইজানটিয়াম-এর কারিগরদের মত কুশলী ছিল না। তাই পশ্চিম ইউরোপের রাজা, বিশপ ও ধনী ব্যক্তিরা বাইজানটিয়াম থেকে স্থপতি, মণিকার, চিত্রকরদের নিজেদের দেশে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেত।

কনসটান্টিনোপল, এ্যান্টিওক এবং আলেকজান্দ্রিয়াতে লক্ষ লক্ষ লোক বাস করত। এইসব নগরের পথের দু'পাশে এবং বাজারগুলিতে অসংখ্য দোকান ও কর্মশালা গড়ে উঠেছিল। জাস্টিনিয়ান-এর শাসনকালে কয়েকজন খ্রীষ্টান সাধু চীন থেকে লুকিয়ে রেশমের গুটিপোকা বাইজানটিয়ামে নিয়ে আসেন। রেশমবস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, অলংকার, কাচের জিনিসপত্র ইত্যাদি নির্মাণের জন্য বাইজানটিয়াম-এর শিল্পী ও কারিগরদের খুব খ্যাতি ছিল। গ্রামবাসীরা শহরে বিক্রীর জন্য গ্রাম থেকে শস্য, মাখন মাংস ইত্যাদি নিয়ে আসত।

সমসাময়িক একজন লেখক রাজধানী কনস্টান্টিনোপলকে একটি "বিশাল বিলাস কর্মশালা" রূপে উল্লেখ করেছেন। কনস্টান্টিনোপল থেকে স্থলপথে ইউরোপ হতে এশিয়ায় এবং জলপথে ভূমধ্যসাগর থেকে কৃষ্ণসাগরে যাতায়াত ছিল। কনস্টান্টিনোপল বন্দরে সব সময় বহু জাহাজ নোঙর করা থাকত। ভারত, চীন এবং ইরাণের সঙ্গে বাণিজ্য করার ফলে বাইজানটিয়াম-এর বণিকরা খুব ধনী হয়ে উঠেছিল। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজকোষও ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কারণ বাইজানটিয়াম-এর সম্রাটগণ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কর ও শুল্ক বাবদ বহু অর্থ আদায় করতেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে বাইজানটিয়াম-এর বণিক ব্যবসায়ীরা বিদেশে যেত। তারা বিদেশের লোকদের জীবনযাত্রা জানার চেষ্টা করত। কারণ বিদেশীদের জীবনযাত্রা, চাহিদা ইত্যাদি জানতে পারলে ভালোভাবে ব্যবসা করা যায়। বণিকরা বিদেশযাত্রার পথঘাট, বিভিন্ন দেশের জলবায়ু ইত্যাদির সঙ্গেও পরিচিত হত। বাইজানটিয়াম-এর পণ্ডিত সমাজ বণিক ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিদেশের সংবাদ শুনতেন। তাঁর এইসব সংবাদের উপর ভিত্তি করে পুস্তক রচনা

করতেন। এভাবেই ভূগোল এবং ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক বই লেখা হয়েছিল।

বিশাল বাইজানটাইন সাম্রাজ্য পরিচালনা, শাসনকার্য ও কর সংগ্রহের জন্য শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন ছিল। বাইজানটিয়াম-এর সম্রাটগণ এইসব কাজের জন্য শিক্ষিত লোক নিয়োগ করতেন। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পৌরসভাগুলি বিদ্যালয় পরিচালনা করত।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

এইসব বিদ্যালয়ে লিখন, পঠন, গণিত ইত্যাদি বিষয় শেখান হত। অবশ্য শুধুমাত্র ধনিক শ্রেণীর সন্তানগণই শিক্ষাই সুযোগ পেত। সাধারণ লোকেদের তেমন কোন শিক্ষার সুযোগ ছিল না। বাইজানটাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রোকোপিয়াস ছিলেন তাঁর রাজত্বকালের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। প্রোকোপিয়াস জাস্টিনিয়ান-এর সেনাপতি বেলিসারিয়াস-এর সঙ্গে যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি এই অভিযানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে আগাথেইস এবং এফিসাস-এর জন উল্লেখযোগ্য। ষষ্ঠ শতাব্দীতে রোমানোস নামে একজন কবি ধর্মীয় কবিতা রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন।

শিল্প এবং স্থাপত্যকীর্তির জন্যও বাইজানটিয়াম বিখ্যাত ছিল। বিশেষ করে মোজেইক বা রঙীন মর্মরপ্রস্তর কাচ ইত্যাদির টুকরা জোড়া দিয়ে আস্তরণের কাজের জন্য বাইজানটিয়াম শিল্পীদের সুনাম দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেন্ট সোফিয়া গির্জার গঠনপ্রণালী, গবাক্ষের মধ্য দিয়ে গির্জার অভ্যন্তরে আলোকপাতের ব্যবস্থা, গির্জার দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্রাদি আজও দর্শকদের বিস্মিত করে।

বাইজানটিয়াম ছিল গ্রীক সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত দেশ। বাইজানটিয়াম-এর প্রধান ভাষাই ছিল গ্রীক। বাইজানটিয়ামে প্রাচীন

সংস্কৃতি সংরক্ষণ

সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান

গ্রীক সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি সযত্নে সংরক্ষিত হত। পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির লিখন, পঠন ও গণিত ব্যতীত প্রাচীন গ্রীক লেখক এবং বিজ্ঞানীদের রচনা সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা হত। সোফোক্লিস, ইউরিপিডিস প্রমুখ গ্রীক নাট্যকারদের রচনা

বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে সংরক্ষিত ছিল। কনসটান্টিনোপলে গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের কমিশন পর্যন্ত গঠন করা হয়েছিল। কমিশন-এর সদস্যগণ রাজকীয় গ্রন্থাগারের জন্য দুষ্প্রাপ্য পুস্তকগুলি নকল করে রেখেছিলেন।

বাইজানটাইন সাম্রাজ্য প্রাচীন সংস্কৃতি সর্বাধিক রক্ষিত হয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়ামে। কার্যত আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়াম ছিল একটি বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সাহিত্য, জ্যোতিষ, গণিত এবং চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এই মিউজিয়ামটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রীক মনীষীদের রচনা ও চিন্তাধারায় আলেকজান্দ্রিয়া সমৃদ্ধ ছিল। একসময় এখানকার গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ছিল চার লক্ষ। প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল-এর গ্রন্থাগার এথেন্স থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়ামে স্থানান্তর করা হয়েছিল। গ্রীক দার্শনিক চিন্তায় বিজ্ঞান, সৃষ্টিতত্ত্ব, ইতিহাস এবং ভূগোল দর্শনের অঙ্গীভূত ছিল। প্রাচীন গ্রীসে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের আবির্ভাব হয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়ামে সক্রেটিস, প্লেটো প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তা আলোচিত হলেও এ্যারিস্টটল-এর দর্শন-চিন্তাই বেশী প্রাধান্য পেয়েছিল। এ্যারিস্টটল পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে জীববিদ্যা অনুশীলনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রখ্যাত গ্রীক বিজ্ঞানী ইউক্লিড, আর্কিমিডিস প্রমুখ বিজ্ঞানীদের চিন্তাও মিউজিয়ামে শিক্ষা দেওয়া হত। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল দিনে এইভাবে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান সংরক্ষিত হয়েছিল। সপ্তম শতাব্দীতে আরবরা আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগারটি ভস্মীভূত করে।

আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়াম

## অনুশীলনী (১)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) বাইজানটিয়াম-এর প্রধান ভাষা কি ছিল? (২) বাইজানটিয়াম-এর অধিবাসীরা নিজেদের কি পরিচয় দিত? (৩) বাইজানটিয়াম-এর অধিবাসীগণ নিজেদের সাম্রাজ্যকে কি সাম্রাজ্য বলত? (৪) বাইজানটিয়াম-এর রাজধানীর নাম কি? (৫) কে কনস্টান্টিনোপল প্রতিষ্ঠা করেন?

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ** সঠিক উত্তরটির নিচে দাগ দাও—কনসটেনটাইন-এর মৃত্যুর সময় ভারতের সম্রাট ছিলেন অশোক/সমুদ্রগুপ্ত/স্কন্দগুপ্ত হর্ষবর্ধন।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) বাইজানটিয়াম নামকরণের কারণ কী? সংক্ষেপে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পরিচয় দাও। (২) কে কনস্টান্টিনোপল প্রতিষ্ঠা করেন? পাঁচটি বাক্যে কনস্টান্টিনোপল সম্বন্ধে আলোচনা কর।

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** কীভাবে কনসটেনটাইন সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হন? খ্রীষ্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্মরূপে গ্রহণ করার ফলে তাঁর শাসনকার্যের কী সুবিধা হয়েছিল?

## অনুশীলনী (২)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) কার রাজত্বকালে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়? (২) জাস্টিনিয়ান-এর বিরুদ্ধে একটি বিখ্যাত বিদ্রোহের নাম বল।

**মানচিত্রবিষয়ক প্রশ্ন ঃ** ইউরোপের রেখ মানচিত্রে প্রদর্শন কর ঃ কনস্টান্টিনোপল ; ইতালী ; রোম।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) কেন জাস্টিনিয়ান-এর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছিল? (২) জাস্টিনিয়ান-এর সাম্রাজ্য বিস্তার আলোচনা কর। (৩) জাস্টিনিয়ান-এর শাসনকালে আইন সংস্কার ও আইন সংকলন আলোচনা কর। এইসব আইন সংস্কার ও সংকলনের গুরুত্ব কী? (৪) স্থাপত্য, চিত্রাঙ্কন ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকরূপে জাস্টিনিয়ান-এর পরিচয় দাও।

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** জাস্টিনিয়ান-এর শাসনকাল আলোচনা কর।

## অনুশীলনী (৩)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত তিনটি বাণিজ্য নগরের নাম বল। (২) কোন নগরকে 'নূতন রোম' বলা হত?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে বাইজানটিয়াম-এর গুরুত্ব আলোচনা কর। (২) কনস্টান্টিনোপল, এ্যান্টিওক এবং আলেকজান্দ্রিয়ার দোকান, কর্মশালা, কারিগরদের কাজ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির পরিচয় দাও। (৩) বাইজানটিয়াম রাজকোষের সমৃদ্ধির কারণ কী ?

## অনুশীলনী (৪)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) প্রোকোপিয়াস কে ? (২) রোমানোস বিখ্যাত কেন ?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) বাইজানটিয়ান-এর পণ্ডিত সমাজ কী ভাবে ইতিহাস ও ভূগোলের তথ্য সংগ্রহ করতেন ? (২) বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতি আলোচনা কর। (৩) বাইজানটিয়াম-এর শিল্প ও স্থাপত্যকীর্তির পরিচয় সংক্ষেপে লেখ।

## অনুশীলনী (৫)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা চর্চার জন্য কনস্টান্টিনোপলে কী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল ? (২) আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়াম বিখ্যাত কেন ?

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** (১) বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে বাইজানটিয়াম-এর ভূমিকা আলোচনা কর।

## পঞ্চম অধ্যায় | ইসলাম এবং ইসলামের প্রভাব

আরব উপদ্বীপ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত। এই দেশে রয়েছে বিস্তীর্ণ মরুভূমি যেখানে জল পাওয়া যায় না। কোথাও রয়েছে শুষ্ক তৃণভূমি। আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে জলাশয় ও ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর পাশে গড়ে উঠেছে মরূদ্যান। আরবের জলবায়ু শুষ্ক ও উষ্ণ। এদেশে খুব কম বৃষ্টিপাত হয়। মধ্য আরবের তৃণভূমিতে যারা বাস করত তারা অধিকাংশই ছিল যাযাবর। এইসব যাযাবর আরবদের বেদুইন বলা হয়। বেদুইনদের প্রধান জীবিকা ছিল পশুচারণ। উট, ঘোড়া, ছাগল ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে বেদুইনরা শুষ্ক তৃণভূমির একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াত। উট ছিল বেদুইনদের সারাক্ষণের সঙ্গী। বেদুইনরা উটের মাংস খেত, উটের দুধ পান করত, উটের লোম দিয়ে তৈরী পোশাক পরত এবং উটের লোম দিয়ে নির্মিত তাঁবুতে বাস করত। উটকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলা হয়। আরব বেদুইনরা উটে চেপে মরুভূমির একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেত। মধ্য আরব উপদ্বীপে যারা মরূদ্যানে বাস করত সেই সব আরব কিন্তু স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিল। তাদের জীবিকা ছিল কৃষি, বাণিজ্য এবং হস্তশিল্প। তারা মাটির কুটিরে থাকত। কুটিরের চারপাশে তারা আঙ্গুর ও অন্যান্য ফলের বাগান তৈরী করত। আর ছিল খেজুর গাছ। আরব মরূদ্যানের খেজুর গাছ এবং খেজুর ফল বিখ্যাত।

আরব দেশ ও অধিবাসী

প্রাচীনকাল থেকেই বাইজানটিয়াম হতে আফ্রিকা এবং বাইজানটিয়াম হতে ভারত পর্যন্ত বাণিজ্যপথ গড়ে উঠেছিল। এই প্রাচীন বাণিজ্যপথের পাশে আরব উপদ্বীপের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সবচেয়ে বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল মক্কা নগর।

মরুচারী বেদুইন আরবরা স্থায়ী বসতির আরবদের সঙ্গে বিনিময়

প্রথার সাহায্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। বেদুইনরা মক্কা ও অন্যান্য আরব বাণিজ্যকেন্দ্রে উট, ঘোড়া, ছাগল ইত্যাদি পশু নিয়ে যেত এবং এইসব পশুর বিনিময়ে খাদ্যশস্য, বস্ত্র, অস্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করত। বাণিজ্য কেন্দ্রের আরব বণিকদের অবশ্য পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সঙ্গেও ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকে আরবের অধিবাসিগণ বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীর একজন নেতা বা দলপতি থাকত। গোষ্ঠীর লোকজনেরা দলপতির নির্দেশ মেনে চলত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর আবার আলাদা আলাদা দেবতাও ছিল। এক একটি গোষ্ঠী নিজস্ব চারণভূমি স্থির করে নিত। আরব সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রথা এসে গিয়েছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীর চারণভূমি সেই গোষ্ঠীর সকল লোকেরই সাধারণ সম্পত্তি ছিল। সকলেই উট, ঘোড়া বা ছাগল নিজেদের গোষ্ঠীর চারণভূমিতে চরাতে পারত। তবে প্রত্যেক ব্যক্তির পশু ছিল সেই ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আরব সমাজে কোনো ঐক্য ছিল না। নতুন চারণভূমি জয় করার জন্য বা গোষ্ঠীর কোনো লোক ভিন্ন গোষ্ঠীর লোক দ্বারা নিহত হলে, এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীকে আক্রমণ করত। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তখন ভীষণ যুদ্ধ হত।

শ্রেণীবিভাগ

একদিকে আরব সমাজ যেমন গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল, অন্যদিকে আরব সমাজে শ্রেণী বিভাগও এসেছিল। দলপতি এবং তার আত্মীয়স্বজন ছিল উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অধিকাংশ বেদুইন ছিল অত্যন্ত গরিব। তাদের নিজস্ব কোনো পশুও থাকত না। তারা অভিজাত আরবদের পশু চরাত। ক্ষুধার যন্ত্রণায় গরিব বেদুইনরা বুনো খেজুর, এমন কি টিকটিকি পর্যন্ত খেত—পেটে পাথর বেঁধে রাখত। কখনও কখনও যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে এইসব গরিব বেদুইন অভিজাতদের তাঁবু আক্রমণ করত, অভিজাতদের পশুর পাল অন্য জায়গায় হঠিয়ে নিয়ে যেত।

গরিব বেদুইনদের দাবিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর দলপতিরা

ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল। আরব বণিকরাও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিল। তবে তাদের কারণ ছিল ভিন্ন। আরবদের দুর্বলতা ও অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে ইরান দক্ষিণ আরব জয় করেছিল। বাইজানটিয়াম আরব উপদ্বীপের উত্তর অঞ্চলের উপর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। ফলে আরব বণিকদের নিকট লোহিত সাগরের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই আরব বণিকরা চেয়েছিল যে, সমস্ত আরববাসীকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করে বাণিজ্যের পথ উদ্ধার করা।

হজরত মহম্মদ বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত আরবদের ঐক্যবদ্ধ করেন। ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আরবের সম্ভ্রান্ত কোরায়েশ বংশে মহম্মদের জন্ম হয়। তরুণ বয়সে মহম্মদ খাদীজা নাম্নী মহিলার হিসাবরক্ষকের কাজ করতেন। খদীজা ধনী মহিলা ছিলেন। দেশ-বিদেশে তাঁর ব্যবসা ছিল। এই ব্যবসা উপলক্ষে মহম্মদ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। এই সময় তিনি খ্রীষ্টধর্ম এবং ইহুদি ধর্মের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তী কালে মহম্মদ খদীজাকে বিবাহ করেছিলেন। খদীজাকে বিবাহের ফলে তিনি প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হন। চল্লিশ বৎসর বয়সে হজরত মহম্মদ ধর্মের সত্যের সন্ধান লাভ করেন। তিনি নিজেকে "পয়গম্বর" অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষরূপে পরিচয় দান করেন। মহম্মদ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মের নাম ইসলাম। ইসলাম ধর্মের অনুগামীরা মুসলিম বা মুসলমান নামে পরিচিত। শীঘ্রই মহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র আলি ও অন্যান্য বহু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। জীবনে বহু দুর্যোগ ভোগ করে মহম্মদ আরবের শহর মদিনাতে একটি সরকার গঠন করেন। মদিনা সরকারের ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে, শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে সকল সম্প্রদায় এক হয়ে শত্রুকে বাধা দেবে এবং মদিনা সরকারের রাষ্ট্রপতি হবেন আল্লার প্রেরিত পুরুষ হজরত মহম্মদ।

হজরত মহম্মদ এবং তাঁর শিক্ষা

মহম্মদের শিক্ষা ছিল—সব মানুষ সমান। সৃষ্টিকর্তা বা আল্লা এক। তিনি বলেছিলেন, আল্লা তোমার জাতি বা মুখ দেখেন না।

তিনি হৃদয় দেখেন। যে মানুষ সবচেয়ে পবিত্র, সে-ই আল্লার প্রিয়তম। মহম্মদ পৃথিবীতে সমস্ত ধর্মবীরদের শ্রদ্ধা করতে বলেছেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কর্তব্য সম্বন্ধে হজরত মহম্মদ বলেছেন—ক্রীতদাসদের জন্য তোমার নিজের মতই আহারের ব্যবস্থা করবে। তোমার নিজের পোশাক-পরিচ্ছদের মতই ক্রীতদাসদের পোশাক-পরিচ্ছদ করবে। তাদের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করবে না। মহম্মদ বলেন—সমস্ত মুসলমান ভাই।

৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মদিনায় ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মহম্মদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর তিরোধানের পর ইসলাম একটি প্রবল শক্তিতে পরিণত হয়। মহম্মদের মৃত্যুর পর মাত্র ১১৮ বৎসরের মধ্যে ভারতের সিন্ধুনদ থেকে ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত ইসলামের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

খলিফা-ইসলামের প্রসার এবং আরব সাম্রাজ্য

মৃত্যুর পূর্বে হজরত মহম্মদ তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে যান নি। এর ফলে মহম্মদের পর কে তাঁর স্থান নিতে পারবে—এই প্রশ্ন নিয়ে মুসলিম সমাজে মতভেদ দেখা দেয়। তাছাড়া মহম্মদের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে মহম্মদের বিরোধীরাও আরবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতি থেকে শিশু আরব মুসলিম রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য আরবের মুসলিম প্রধানগণ এক মত হয়ে আবুবকর সিদ্দিককে মহম্মদের উত্তরাধিকারীরূপে খলিফা পদে নির্বাচিত করেন। খলিফা হলেন মুসলিম জগতের ধর্মগুরু এবং মুসলিম রাষ্ট্রের শাসনকর্তা। খলিফাদের রাজত্বকালেই ইসলামধর্ম প্রসার লাভ করে এবং বিশাল আরব সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।

প্রথম জীবনে আবুবকর বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। খলিফা পদে নির্বাচিত হওয়ার পর আবুবকর (৬৩২-৩৪ খ্রীঃ) মহম্মদের বিরোধীদের দমন করেন এবং সমগ্র আরবে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেন। আবুবকর সিরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন এবং সিরিয়া জয় করেন। সিরিয়া ছিল বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ।

আবুবকরের শাসনকালে মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়।

পরবর্তী খলিফা ছিলেন ওমর ফারুক ( ৬৩৪-৪৪ খ্রীঃ )। ওমরের নেতৃত্বে সমগ্র মেসোপোটেমিয়া (ইরাক) আরবের অধিকারভুক্ত হয়। ওমর পারস্যও জয় করেন।

সিরিয়া এবং পারস্য জয় করে মরুভূমির দেশ আবার বিশাল উর্বর অঞ্চলের উপর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করল। তাছাড়া আরব উপদ্বীপের বাইরেও ইসলামধর্ম প্রসারিত হল।

ওমরের পর ওসমান গণি খলিফা হন ( ৬৪৪-৫৬ খ্রীঃ )। খলিফা-পদে অভিষিক্ত হওয়ার সময় ওসমান ছিলেন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ। ওসমানের শাসনকালে ঈজিপ্ট ( মিশর ), ত্রিপোলী এবং উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চল ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করে। খলিফা ওসমানের সময়েই সর্বপ্রথম আরব নৌ-বাহিনী গঠিত হয়। আরব নৌ-বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি ছিল আলেকজান্দ্রিয়া। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আরবরা বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর আঘাত হানতে থাকে। মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্থান, বাল্‌খ ও অন্যান্য অঞ্চলও ওসমানের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

খলিফা ওসমান এবং পরবর্তী খলিফা আলি মর্তুজা ( ৬৫৬-৬৬ ) দু'জনেই তাঁদের বিরোধীদের হস্তে নিহত হয়েছিলেন। আবুবকর থেকে আলী মর্তুজা পর্যন্ত খলিফা-পদ বংশানুক্রমিক ছিল না। খলিফারা নির্বাচিত হতেন। আলী মর্তুজার পর মুসলিম সাম্রাজ্যে বিভেদ চরমে ওঠে। আলীর প্রতিদ্বন্দ্বী সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া ঈজিপ্ট ও উত্তর আফ্রিকা অধিকার করেন। এরপর খলিফা-শাসন বংশানুক্রমিক রাজশাসনে পরিণত হয়।

সপ্তম শতাব্দী থেকে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল থেকে ভারত এবং চীন সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে আরব খলিফা সাম্রাজ্য বা খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। সিরিয়ার বিখ্যাত নগর দামাস্কাস ছিল এই সাম্রাজ্যের রাজধানী।

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে মেসোপোটেমিয়ায় ( ইরাক )

আব্বাসীয় বংশের খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলে ইসলামধর্মে রূপান্তরিত করার কাজও অষ্টম শতাব্দী থেকেই প্রবল বেগে আরম্ভ হয়েছিল। আব্বাসীয় খিলাফতের রাজধানী ছিল বাগদাদ।

৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে উমায়েদ বংশের (মুয়াবিয়ার বংশধর) খলিফা বালিদ দামাস্কাস-এর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর শাসনকালে স্পেন মুসলিম অধিকারভুক্ত হয়। ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি জেবেল তারিফ উত্তর আফ্রিকা হতে জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনে উপনীত হন এবং করডোবা জয় করেন। জেবেল তারিফের নাম অনুসারেই জিব্রাল্টার নাম হয়েছে।

করডোবা উমায়েদ খলিফাদের অধীন স্পেনের রাজধানী হয়। সে সময়ে ইউরোপে করডোবার সমকক্ষ নগর কমই ছিল।

করডোবা

নিকটবর্তী পাহাড় হতে রাজধানীতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খলিফা-শাসনকালে করডোবাতে অভিজাত পরিবারের পঞ্চাশ হাজার সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, সাধারণ লোকের জন্য লক্ষাধিক গৃহ, সাত-শ গ্রন্থাগার, সাধারণের ব্যবহারের জন্য ন-শ স্নানাগার এবং অসংখ্য পুস্তকের দোকান গড়ে ওঠে। করডোবা ইউরোপের শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত হয়। করডোবার মাধ্যমেই ইউরোপ খলিফা-শাসিত দেশগুলির সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল।

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে স্পেনে একটি স্বাধীন আরব রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

স্পেন ইউরোপের একটি দেশ। খলিফা বালিদের শাসনকালে স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে স্পেনের রাজা ছিলেন গথ জাতির নেতা রোডেরিক। মুসলিম আক্রমণ থেকে

ইউরোপে প্রতিক্রিয়া

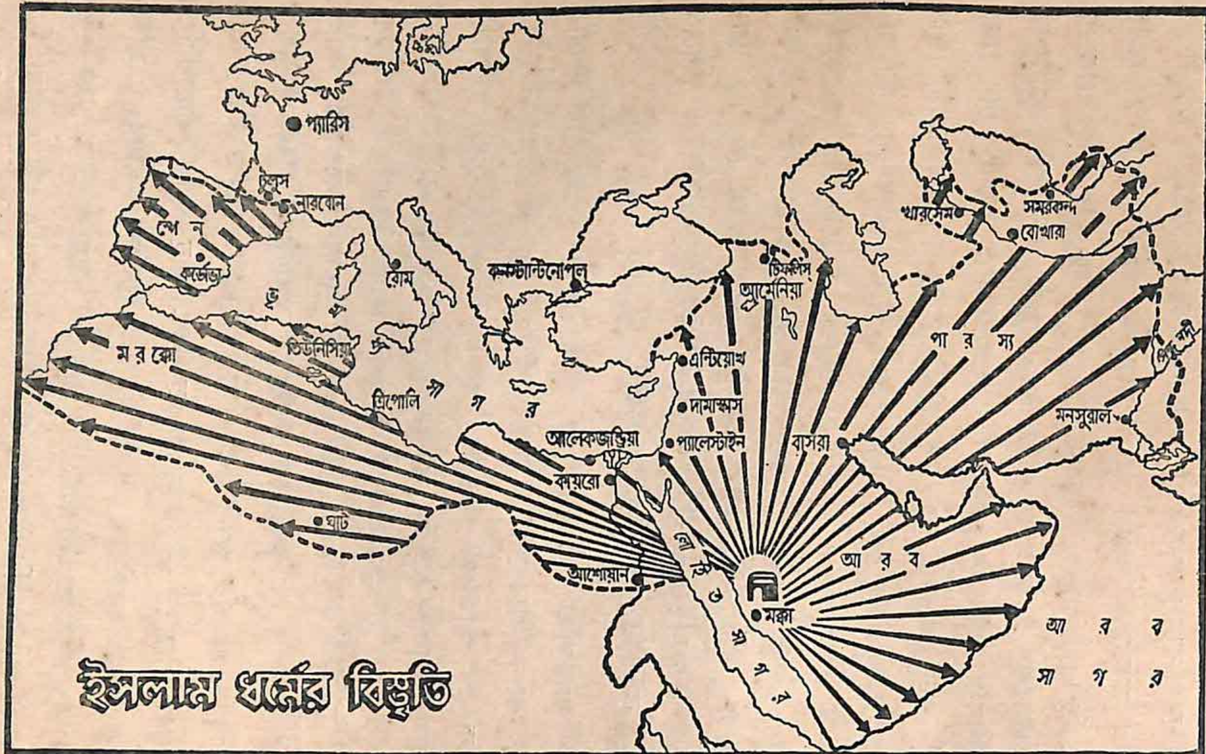
প্রাণ রক্ষার জন্য পলায়ন করতে গিয়ে রোডেরিক জলে ডুবে মারা যান। গথ শাসনাধীনে স্পেনের ভূমিদাস ও ইহুদীরা নির্যাতিত হত। নির্যাতিত শ্রেণীর লোকেরা আক্রমণকারী মুসলিমদের বাধাদান করেনি।

স্পেন জয় করে আরব সেনাবাহিনী পিরেনীজ পর্বতমালা অতিক্রম করে ফ্রাঙ্ক রাজ্য আক্রমণ করেছিল। ফ্রাঙ্করা আরব আক্রমণ প্রতিরোধ করে। তবে আরব আক্রমণের প্রচণ্ডতা ও রণকৌশল দেখে ফ্রাঙ্কদের যুদ্ধাস্ত্র এবং সামরিক বাহিনীর সংস্কার করতে হয়েছিল। আরব আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ফ্রাঙ্কদের ভূমিব্যবস্থারও সংস্কার করতে হয়। যুদ্ধে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাহায্যলাভের আশায় ফ্রাঙ্করাজ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচুর জমি বণ্টন করেন। এভাবে একটি যোদ্ধা জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হল। ক্রমে এই যোদ্ধা জমিদারদের জমি ভোগদখলের অধিকার বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। ৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে উমায়েদ বংশের যুবরাজ আবদুর রহমান স্পেনে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘকাল ধরে এই স্বাধীন রাজ্যটি স্পেন শাসন করে। দশম শতাব্দীতে বাইজেনটিয়াম-এর সম্রাট সপ্তম কন্‌সটেনটাইন স্পেনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

অষ্টম শতাব্দীতে আব্বাসীয় বংশের খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আরবদের আক্রমণকারী ভূমিকা কমে যেতে থাকে। শুরু হয় আরবদের সভ্যতার যুগ। মধ্যযুগের ইতিহাসে আরব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অবদান উল্লেখযোগ্য। মনে রাখতে হবে,

আরব সংস্কৃতির অবদান

বহু দেশ ও বহু জাতি আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব আরব অবদান বলতে শুধু আরব উপদ্বীপের অধিবাসী মনীষীদের অবদানই বুঝায় না। এমনি কি, শুধু ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অবদানও বুঝায় না। আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বহু দেশ, বহু জাতি এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মনীষীদের অবদানে সৃষ্টি হয়েছিল আরব সংস্কৃতি। ইসলামধর্ম অবশ্য এইসব বিভিন্ন জাতি ও দেশকে ঐক্যবন্ধনে বেঁধে দিতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। সংস্কৃতি চর্চার ভাষা ছিল আরবী। একজন পারসী প্রথম আরবী ব্যাকরণ প্রণয়ন করেছিলেন। জ্যোতির্বিদ মাশা আল্লা ছিলেন ঈজিপ্টের ইহুদী। বিখ্যাত অনুবাদক ইসাক এবং লুকা ছিলেন খ্রীষ্টান।




ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতি

শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তৎকালীন খলিফা, বণিক এবং অভিজাতদের আগ্রহের ফলেই আরব সংস্কৃতির বিকাশ হয়। প্রথমে অনুবাদ কর্মের মধ্য দিয়ে এই সংস্কৃতির সূত্রপাত হল। বিভিন্ন দেশ জয় করে আরবরা ভারত, গ্রীস প্রভৃতি দেশের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধান পায়। তারা এইসব পুস্তক আরবী ভাষায় অনুবাদ করে। বিশেষত প্রাচীন গ্রীক জ্ঞানসাধনা আরবী অনুবাদের মধ্য দিয়েই সুরক্ষিত হয়েছিল। ক্রমে আরব সংস্কৃতির নিজস্ব রূপ প্রকাশ পায়। যেসব আরব বণিক ও উষ্ট্রচালকরা ব্যবসা উপলক্ষে দূর দূর দেশে যেত, তারা দেশে ফিরে এসে সেই সব দেশের গল্প বলত। বাগদাদের জেলে এবং অন্যান্য শ্রমজীবীরাও নিজেদের মধ্যে অনেক মজাদার কাহিনী বলত। এইসব কাহিনী নিয়েই সৃষ্টি হল বিখ্যাত "আরব্য রজনীর গল্প"। খলিফারা সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুরাগী ছিলেন। মসজিদ এবং প্রাসাদ নির্মাণের স্থাপত্য-কৌশল, মসজিদের ছাদ ও মিনারের গঠনভঙ্গী, দেওয়ালে সূক্ষ্ম অলংকরণ আজও আরব সংস্কৃতিকে গৌরব দান করছে। ইসলামধর্মে মূর্তি নির্মাণ এবং চিত্রাঙ্কন সম্পর্কে কিছু নিষেধ আছে। সেজন্য ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কনে আরব সংস্কৃতি বিশেষ বিকাশ লাভ করে নি। তবে বিজ্ঞানচর্চা, বিশেষ করে গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভেষজবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যায় আরব মনীষীদের পাণ্ডিত্য ছিল বিস্ময়কর। আরব সাম্রাজ্যে শিক্ষার জন্য বহু মক্তব এবং উচ্চশিক্ষার জন্য বহু মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল। উচ্চশিক্ষার জন্য একমাত্র করডোবাতেই সাতাশটি প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রতি বৎসর করডোবায় ষোল হাজার পুস্তক অনূদিত হত। আরবের জ্ঞানচর্চার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল হতে বহু শিক্ষার্থী ও জ্ঞানসাধক করডোবায় আসতেন। ইউরোপের চিকিৎসকগণ সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত **অভিসেনার** চিকিৎসা-বিষয়ক পুস্তক 'কানুন ফিল-টিব' (ঔষধ-তত্ত্ব)-এর উপর নির্ভর করতেন। ল্যাটিন ভাষায় পুস্তকটি অনুবাদ করা হয়েছিল। আভিসেনার আসল নাম ইবনসিনা।

কতিপয় জ্ঞান-সাধকের পরিচয়

আল খোয়ারিজমি ছিলেন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ। তিনি মধ্য এশিয়ার খিভা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থও ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। ঈজিপ্টের **ইবন আল হাইথাম** ছিলেন পদার্থবিদ্। আলোক সংক্রান্ত গবেষণার জন্য তিনি বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আল বীরুণীও ছিলেন খিভার লোক। ভারত সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থের নাম 'তারিখ আল হিন্দ্'। আল বীরুণীর ইতিহাস ব্যতীত গণিত, ভূগোল, চিকিৎসাবিদ্যা এবং জোতির্বিদ্যাতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। দশম শতাব্দীর চিকিৎসক **আবু মনসুর মুবাফাক** বনৌষধি সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থগুলিতে উদ্ভিদ ও ঔষধের বর্ণনায় বহু সংস্কৃত শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায় মুবাফাক ভারতীয় বনৌষধির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

## অনুশীলনী (১)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) কোন্ পশুকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলা হয়? (২) মরুচারী যাযাবর আরবদের কি বলা হত? (৩) আরব উপদ্বীপের সর্বাধিক বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র কি ছিল?

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ** যে উত্তরটি সঠিক মনে কর তার পাশে ✓ চিহ্ন দাও— আরব বণিকরা ঐক্যবদ্ধ হতে চেয়েছিল, কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

(ক) বেশী লাভ করা। (খ) বণিক সমিতি গড়া। (গ) বাণিজ্যপথ উদ্ধার করা।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক পরিচয় ও অধিবাসীদের কথা আলোচনা কর। (২) আরবের বাণিজ্যপথ ও ব্যবসা-বাণিজ্য বর্ণনা কর। (৩) সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে আরবের সমাজ-ব্যবস্থা কী ছিল? (৪) বেদুইনদের অবস্থা বর্ণনা কর।

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** সপ্তম শতাব্দীর আরবের বাণিজ্য, সমাজ ও শ্রেণীবিভাগ আলোচনা কর। কেন আরব বণিকরা ঐক্যবদ্ধ হতে চেয়েছিল?

## অনুশীলনী ২)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) কে ইসলামধর্ম প্রবর্তন করেন? (২) কত

খ্রীষ্টাব্দে হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন ? (৩) কোন্ ধর্মনেতা "পয়গম্বর" রূপে সম্মানিত ?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) হজরত মহম্মদের জীবনী আলোচনা কর। (২) হজরত মহম্মদ কি শিক্ষা দিয়েছিলেন ?

## অনুশীলনী (৩)

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ** ঐতিহাসিক ক্রম রক্ষা করে খলিফাদের নামগুলি পর পর সাজিয়ে দাও—ওসমান গণি ; আলী মর্তুজা ; আবুবকর ; ওমর ফারুক।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) কাদের খলিফা বলা হত ? কী পরিস্থিতিতে প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন ? (২) প্রথম দু'জন খলিফার শাসনকাল আলোচনা কর। (৩) কেন খলিফা-শাসন বংশানুক্রমিক হল ?

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** খলিফা-শাসনকালে আরব সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি আলোচনা কর।

## অনুশীলনী (৪)

**মানচিত্র বিষয়ক প্রশ্ন ঃ** ইউরোপের রেখ মানচিত্রে প্রদর্শন কর—জিব্রালটার প্রণালী ; স্পেন ; করডোবা।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) কোন্ মুসলিম সেনাপতি করডোবা জয় করেন ? খলিফা শাসনাধীনে করডোবার বর্ণনা দাও। (২) স্পেন খলিফা শাসনাধীনে আসার ফলে ইউরোপে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ?

## অনুশীলনী (৫)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) আরব সংস্কৃতি বলিতে কী বোঝা যায় ? (২) কয়েকজন বিখ্যাত মুসলিম জ্ঞানসাধকের পরিচয় দাও।

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** মধ্যযুগের ইতিহাসে আরব সংস্কৃতির অবদান আলোচনা কর।

| ষষ্ঠ অধ্যায় | মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ<br>( ৮০০-১২০০ খ্রীঃ ) |
|---|---|

## (ক) শার্লামেন

ফ্রাঙ্করাজ পিপিন-এর শাসনকালে ইউরোপের নবসৃষ্ট যোদ্ধা-জমিদার শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। পিপিন-এর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, শার্লামেন ফ্রাঙ্কদের রাজা হন। শার্লামেন ছেচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন ( ৭৬৮-৮১৪ )। জীবনের শেষ চৌদ্দ বৎসর শার্লামেন শুধু ফ্রাঙ্কদেরই রাজা ছিলেন না, তিনি রোমান সম্রাট-রূপেও শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। শার্লামেন ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং নিপুণ সমরনায়ক। তাঁর রাজত্বকালে ফ্রাঙ্করা পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে পঞ্চাশটিরও বেশী সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। ইতালী অভিযান করে শার্লামেন ইতালীর একটি বিরাট অংশ নিজ অধিকারভুক্ত করেন। শার্লামেন যে-সব দেশ জয় করেছিলেন, সে-সব দেশের বহু জমি যোদ্ধা-জমিদারদের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন। শার্লামেন স্পেনের আরবদের বিরুদ্ধেও অভিযান করেছিলেন এবং পীরেনিজ পর্বতমালা অতিক্রম করে স্পেনের কিছু অংশ জয় করেছিলেন।



শার্লামেন

স্যাক্সনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই শার্লামেনকে সবচেয়ে কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

স্যাক্সনরা ফ্রাঙ্ক রাজ্যের উত্তর-পূর্ব দিকে রাইন এবং এল্‌ব্‌ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাস করত। শার্লামেন আটবার স্যাক্সনদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। কিন্তু তিনি স্যাক্সনদের দমন করতে ব্যর্থ হন। অবশেষে শার্লামেন স্যাক্সন অভিজাতদের বহু জমি ও ভূমিদাস দিয়ে তাদের সহযোগিতা লাভ করেন। স্যাক্সন অভিজাতদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই শার্লামেন স্যাক্সনদের জয় করতে সমর্থ হন।

ক্রমে ক্রমে রাজ্যজয়ের মধ্য দিয়ে ফ্রাঙ্করাজ শার্লামেন পূর্বেকার পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের প্রায় সমান একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

এই সময় লিও ছিলেন রোমের পোপ। পোপ পশ্চিম ইউরোপের খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরু। স্যাক্সনদের বিরুদ্ধে অভিযানে শার্লামেন খ্রীষ্টান চার্চ-এর সাহায্য লাভ করেছিলেন। তিনি পরাজিত স্যাক্সনদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতেও বাধ্য করেছিলেন।

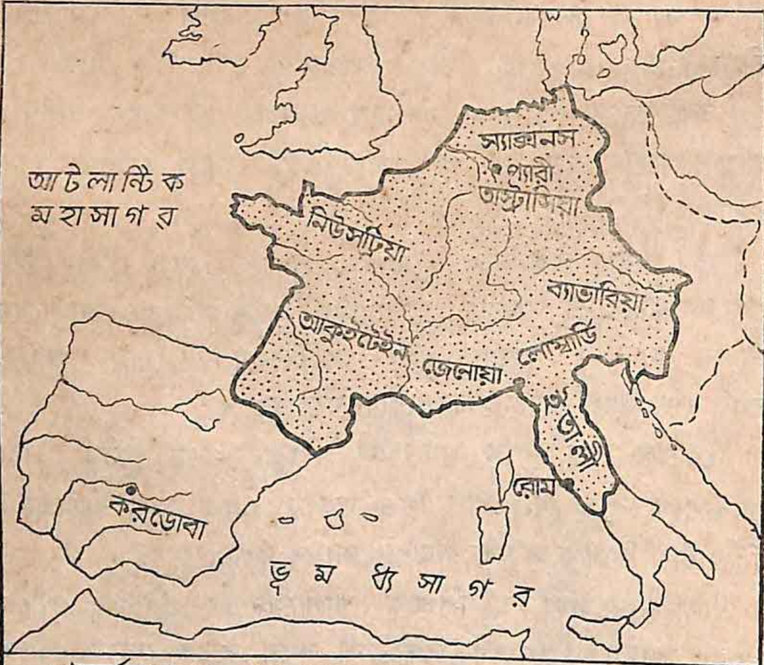
রোমের কিছু লোক পোপ-এর বিরোধী হয়ে ওঠে। তারা অভিযোগ করে যে, পোপ লিও অন্যায় কাজে লিপ্ত রয়েছেন। বিরোধীরা লিওকে প্রকাশ্য রাজপথে আহত করে।

পোপ-এর সমর্থকরা লিওকে শার্লামেন-এর শিবিরে পৌঁছে দেয়। শার্লামেন পোপের সঙ্গে রক্ষী দিয়ে তাঁকে রোমে পৌঁছে দেন। কিছুদিন পর শার্লামেন নিজে রোমে যান। রোমে শার্লামেন ঘোষণা করেন যে, পোপের বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা ; পোপ লিও নির্দোষ।

**পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য**

সেদিন খ্রীষ্টমাস, ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ। খ্রীষ্টের জন্মের পবিত্র দিন উপলক্ষে রোম উৎসবমুখর। শার্লামেন রোমের সেণ্ট পিটার্স গির্জায় ঈশ্বরের উদ্দেশে নতজানু হয়ে প্রণাম জানাচ্ছেন—ঠিক এমন সময় পোপ লিও শার্লামেন-এর মস্তকে রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন, তাঁকে রোমানদের সম্রাট রূপে ঘোষণা করলেন। পোপের ঘোষণার ফলে জার্মান উপজাতি ফ্রাঙ্কদের রাজা শার্লামেন রোমান সম্রাটের মর্যাদা লাভ করলেন। বাইজানটিয়াম-এর সম্রাট মাইকেল শার্লামেনকে রোমান সম্রাট রূপে স্বীকৃতি জানালেন।

মাইকেল-এর স্বীকৃতি লাভের পর শার্লামেন রোমান রীতি অনুসারে তাঁর পুত্রকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। বর্তমান ফ্রান্স, উত্তর ইতালী, উত্তর স্পেন এবং পশ্চিম জার্মানির বৃহৎ অংশ পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।




শার্লামেন-এর সাম্রাজ্য

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শার্লামেন-এর রাজসভায় যাঁরা রোমানদের ভাষা, লিখন-পদ্ধতি, রোমান আইন-কানুন ইত্যাদি জানেন, তাঁরা উচ্চ-স্থান লাভ করলেন। বিচার ও শাসনকার্যে রোমান আইন প্রচলিত হল। রোমান পদ্ধতির অনুকরণে শার্লামেন ভূমিব্যবস্থাকে ডিউক, কাউন্ট ইত্যাদি ভাগে ভাগ করলেন। তবে অতীত রোমান পদ্ধতি চালু করার সময় শার্লামেন তাঁর নিজস্ব প্রতিভার ছাপ রেখে গিয়েছিলেন। শার্লামেন-এর শাসনকালে স্বৈরাচারী রাজশাসনের পরিবর্তে সামন্ততান্ত্রিক রাজশাসন প্রচলিত হল।

শর্লামেন-এর রাজ্যাভিষেকের গুরুত্ব রয়েছে। সে সময় পশ্চিম

ইউরোপে ধর্মগুরু পোপ অত্যন্ত শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। পোপের নিকট হতে মুকুট ও রোমান সম্রাট উপাধি লাভ করে শার্লামেন আশা করেছিলেন যে, পোপের দেওয়া এই সম্মানের ফলে তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। পরাজিত দেশের অধিবাসীরা স্বচ্ছন্দ চিত্তে রোমান সম্রাটদের শাসন মেনে নেবে। কেননা জনসাধারণের মনে রোমান সম্রাট এবং রোমান সাম্রাজ্য তখন পর্যন্ত একটি উজ্জ্বল স্মৃতি। তারা ফ্রাঙ্কদের অধীন থাকা অপেক্ষা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রজা রূপে গৌরববোধ করতে পারবে। অন্যদিকে পোপ কর্তৃক শার্লামেনকে সম্রাট ঘোষণা এবং মুকুট দান—এই ঘটনা খ্রীষ্টান জগতে পোপের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে। শার্লামেন সম্রাট ঘোষিত হওয়ার এক হাজার বৎসর পর কর্সিকার (কর্সিকা ফ্রান্সের দক্ষিণে একটি দ্বীপ) সন্তান নেপোলিয়ন "ফরাসীদের সম্রাট" হন (১৮০৪)। তখন নেপোলিয়নও সম্রাটের মুকুট লাভের জন্য তৎকালীন পোপ সপ্তম পায়াসকে আমন্ত্রণ করে প্যারিসে নিয়ে এসেছিলেন। শার্লামেন-এর এক হাজার বছর পরের ঘটনা পোপের মর্যাদা ও প্রতিপত্তির প্রমাণ বহন করে। আরও একটি কারণে শার্লামেন-এর রাজ্যাভিষেকের গুরুত্ব রয়েছে। যেভাবে পোপ শার্লামেনকে সম্রাট রূপে অভিষিক্ত করলেন, তার ফলে পরবর্তী কালে সম্রাট এবং পোপের মধ্যে কে বড় এই প্রশ্ন নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিয়েছিল।

রাজ্যাভিষেকের গুরুত্ব

সম্রাট হিসাবে শার্লামেন কখনও নিজেকে পোপের অধীন মনে করেন নি। তিনি প্রয়োজনবোধে ধর্মসম্পর্কিত বিষয়েও হস্তক্ষেপ করেছেন। উচ্চপদস্থ যাজকদের বিশপ বলে। বিশপদের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল যে, বিশপরা যেন সাধারণ পরিষদের ধর্মজ্ঞান পরীক্ষা করেন। শার্লামেন মনে করতেন যে, যতদিন তিনি শুধুমাত্র ফ্রাঙ্কদের রাজা ছিলেন ততদিন পোপ তাঁর প্রতি বিশেষ দায়িত্ব স্বীকার না করতে পারেন;—কিন্তু যখন তিনি পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট, তখন পোপকে তাঁর প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিভিন্ন

রাষ্ট্র এবং চার্চ-এর মধ্যে সম্পর্ক

দেশ জয় করার সময় শার্লামেন চার্চ-এর সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। পরাজিত দেশের অধিবাসীদের তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করতেন। এই কাজে খ্রীষ্টান যাজকগণ তাঁকে সাহায্য করত। স্যাক্সনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চার্চ শার্লামেনকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। শার্লামেন পরাজিত দেশগুলিকে অবস্থিত খ্রীষ্টান মঠ-গুলিকে প্রচুর ভূমিদান করেছিলেন।

রাজসভা-শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

শার্লামেন শুধু সুদক্ষ যোদ্ধা ও কঠোর শাসক ছিলেন না। তাঁর রাজসভা শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিল। শার্লামেন কয়েকটি সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। প্রাসাদ এবং উপাসনা গৃহ তিনি চমৎকার আসবাবপত্র দিয়ে সুসজ্জিত করেছিলেন। স্বর্ণকার, হস্তী-দন্তশিল্প এবং ধাতুশিল্পীদের কাজ এই সময় অত্যন্ত উন্নত হয়। শার্লামেন-এর বিদ্যানুরাগ ছিল অসাধারণ। তিনি তাঁর রাজসভায় বিভিন্ন জাতির পণ্ডিত ব্যক্তিদের আসন দিয়েছিলেন। ইতালীর পিসা থেকে এসেছিলেন সেকালের বিখ্যাত বৈয়াকরণ পিটার, এসেছিলেন ভিসিগথের কবি থিওডোল্ফ্, লম্বার্ডের ঐতি-হাসিক পল, এনহার্ড, এ্যালকুইন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এনহার্ড শার্লামেন-এর জীবনী রচনা করেছিলেন। এ্যালকুইন ছিলেন সম্রাটের শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শদাতা। এ্যালকুইন-এর পরামর্শ অনুসারে শার্লামেন শিক্ষা-সনদ প্রণয়ন করেন। শিক্ষা-সনদে প্রত্যেক খ্রীষ্টান মঠ এবং গির্জাকে বিদ্যালয় স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। গির্জার বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা এবং মঠের বিদ্যালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এ্যালকুইন শুধু শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতা ছিলেন না। তিনি কবিও ছিলেন। শার্লামেন-এর রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় ল্যাটিন গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হয়।

## (খ) খ্রীষ্টীয় মঠ

মঠে বাস করে ধর্মীয় জীবন যাপন করা শুধু খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের সময় থেকে আরম্ভ হয় নি। ভারতে

বৌদ্ধযুগে বহু শ্রমণ এবং শ্রমণা (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনী) মঠে বাস করতেন। এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও মঠবাসী সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়েছিল। সম্রাট কন্‌সটেনটাইন খ্রীষ্টধর্মকে বাইজান্‌টিয়াম-এর রাষ্ট্রধর্ম রূপে গ্রহণ করার পর থেকেই খ্রীষ্টীয় মঠের আবির্ভাব বিশেষভাবে দেখা যায়।

সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী

খ্রীষ্টধর্মে নিবেদিত সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনী, অর্থাৎ নারী এবং পুরুষ মঠে বাস করতে পারতেন। তবে স্ত্রী এবং পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা মঠ ছিল। একই মঠে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী বাস করতে পারতেন না। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে মেরী নামে একজন মহিলা সন্ন্যাসিনীদের জন্য মঠ নির্মাণ করেছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে সন্ন্যাসিনীদের জন্য বহু মঠ গড়ে ওঠে। সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীদের মঠ-জীবনযাপন ছিল একটি স্বতন্ত্র ধরনের জীবনযাত্রা। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে অথবা ভবঘুরের মত একা একা জীবন ধারণ অপেক্ষা মঠে বাস করে সংগঠিত ও সুশৃংখল জীবন যাপন করা যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে সেণ্ট বেনেডিক্ট-এর ভগ্নী সন্ন্যাসিনী রূপে একটি নারীদের মঠে প্রবেশ করেন। এই মঠের সন্ন্যাসিনীরা সেণ্ট বেনেডিক্ট কর্তৃক সন্ন্যাসিনী-দের জন্য রচিত যাবতীয় নিয়ম মেনে চলতেন। পরবর্তী কালে অনেক স্থানে পুরুষদের মঠের পাশে নারীদের মঠ গড়ে উঠেছিল।

খ্রীষ্টীয় মঠগুলিতে ক্রমে ক্রমে নানারকম দুর্নীতি দেখা দিতে থাকে। মঠগুলি প্রচুর জমিজমার মালিক হয়। মঠবাসী সন্ন্যাসীরা আরামের জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মঠজীবনের বিলাস-ব্যসন ও দুর্নীতি দেখে সেণ্ট বেনেডিক্ট নামে একজন সন্ন্যাসী খ্রীষ্টীয় মঠের সংস্কার করেন। খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীদের জন্য তিনি খ্রীষ্টের আদর্শে নূতন করে আশ্রমধর্ম প্রবর্তন করেন। আনুমানিক ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ

সেণ্ট বেনেডিক্ট

থেকে আনুমানিক ৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বেনেডিক্ট জীবিত ছিলেন। রোমে শিক্ষাগ্রহণ কালেই বেনেডিক্ট সন্ন্যাসীদের আচার আচরণ দেখে বিরক্ত হয়েছিলেন। খ্রীষ্টের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বেনেডিক্ট প্রথমে কিছুকাল নির্জন গুহাবাস

করেন। পরে গুহার বাইরে এসে তিনি মণ্টে কাসিনোতে মঠ স্থাপন করেন। সেণ্ট বেনেডিক্ট মঠবাসী সন্ন্যাসীদের জন্য আশ্রমধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। সেণ্ট বেনেডিক্ট কর্তৃক প্রবর্তিত আশ্রমদের নিয়ম ছিল—মিতহার ও মিতাচার, স্বল্পভাষিতা, নম্রতা এবং আজ্ঞানুবর্তিতা। সন্ন্যাসীদের অবশ্যই সংযম ও পবিত্রতা রক্ষা করতে হত এবং দারিদ্র্যব্রত পালনের প্রতিজ্ঞা নিতে হত। সেণ্ট বেনেডিক্ট প্রবর্তিত নিয়ম অনুসারে সন্ন্যাসীদের কর্তব্য ছিল—পাঠ, প্রার্থনা এবং কায়িক শ্রম। প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে প্রত্যহ ছ'ঘণ্টা কায়িক শ্রম করতে হত। বেনেডিক্ট আশ্রমের সন্ন্যাসীরা আশ্রমধর্ম ও কর্তব্য পালনের শপথ নিতেন। পূর্বে শুধু দাস এবং ভূমিদাসদের কায়িক শ্রম করতে হত। সেণ্ট বেনেডিক্ট শ্রম সন্ন্যাসীদের কর্তব্য বলে নির্দেশ দিলেন। বেনেডিক্ট-এর নিয়ম অনুসারে মঠের জমিজমা সম্পত্তি কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হয়ে সমগ্র মঠের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। সন্ন্যাসীরা সকলে কাজ করে মঠকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে মণ্টে ক্যাসিনো মঠের আদর্শে পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র খ্রীষ্টীয় মঠ গড়ে উঠেছিল।

সেণ্ট বেনেডিক্ট-এর আশ্রমধর্ম—সন্ন্যাসীদের শপথ

ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে খ্রীষ্টীয় মঠগুলি ছিল বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানসাধনার প্রধান কেন্দ্র। নবম শতাব্দী পর্যন্ত বেনেডিক্ট আদর্শে প্রতিষ্ঠিত মঠগুলি জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে রেখেছিল। সম্রাট শার্লামেন প্রত্যেক মঠ ও গির্জায় বিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মঠের বিদ্যালয়ে সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ধর্মযাজক ও পাদরিদের শিক্ষার জন্য গির্জার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মঠ ও গির্জার শিক্ষাতালিকা দু-ভাগে বিভক্ত ছিল। এক ভাগকে বলা হত ট্রিভিয়াম বা ত্রিপাঠী। ব্যাকরণ, অলংকার ও ন্যায়শাস্ত্র টিভিয়াম তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্য ভাগকে বলা হত কোয়াড্রিভিয়ান বা চতুষ্পাঠী। সঙ্গীত, জ্যোতিষ, পাটীগণিত ও জ্যামিতি কোয়াড্রিভিয়াম-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মঠ ও গির্জার বিদ্যালয়গুলি শুধু জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানবিতরণই

মঠ ও বিদ্যাচর্চা

করত না। এইসব বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংরক্ষিত হত।

দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে মঠগুলির শৃংখলা পুনরায় নষ্ট হয়। মঠগুলির উপর জমিদার, শাসক ও অন্যান্য সামন্ত-প্রভুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। সেন্ট বেনেডিক্ট-এর আদর্শ থেকে খ্রীষ্টীয় মঠগুলি দূরে সরে যায়। দুর্নীতি এবং ধর্মসম্পর্কবিহীন ও সামন্ত-তান্ত্রিক শাসন থেকে মঠগুলিকে মুক্ত রাখার জন্য সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হল। এই আন্দোলনের কেন্দ্রে ছিল ক্লুনি। ক্লুনি মধ্য-পূর্ব ফ্রান্সের একটি শহর। ৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ক্লুনিতে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে পোপ স্বয়ং ক্লুনির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ক্লুনিকে বিশেষ অধিকার দান করেন। পোপের নিকট হতে এই অধিকার লাভ করার ফলে ক্লুনি সহজেই একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র হতে পেরেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ উত্তীর্ণ হতে না হতেই ইউরোপ মহাদেশের ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং পোল্যাণ্ডে অন্তত ৩, ৪টি মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যারা ক্লুনির নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল। বার্নো, ওডো, শ্রদ্ধাভাজন পিটার প্রমুখ বিশিষ্ট অধ্যক্ষদের শিক্ষা, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের জন্যই ক্লুনি এই সম্মানের আসন অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিল। বিশপ এ্যাডালবেরো বলেছিলেন, "ক্লুনি একটি সৈন্যদল। এই দলে এশিয়ার গাছগুলিতে যত পাতা আছে, অথবা আফ্রিকার উপকূলে যত বালুকণা আছে তার চেয়েও বেশী সৈন্য রয়েছে।" বাস্তবিকপক্ষে সামন্ততান্ত্রিক জীবনের বিলাস, অনাচার ও দুর্নীতি থেকে দূরে থাকার জন্য দলে দলে সন্ন্যাসী ক্লুনি. বা ক্লুনির আদর্শে গঠিত খ্রীষ্টীয় মঠগুলিতে যোগ দিয়েছিল। মঠ-জীবনকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য ক্লুনির নির্দেশ ছিল কেউ যেন ঘুষ দিয়ে গির্জার যাজকত্ব গ্রহণ না করে এবং কেউ যেন ঘুষ নিয়ে কাউকে যাজকত্ব না দেয়। ক্লুনির আদর্শ ছিল সন্ন্যাসীদের চিরকুমার থাকতে হবে এবং সন্ন্যাস-জীবনের উচ্চ মান রক্ষা করতে হবে। ধর্মসম্পর্কবিহীন এবং সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব থেকে মঠকে মুক্ত রাখার

ক্লুনি

জন্য ক্লুনি এই মর্মে নিয়ম প্রণয়ন করে যে, পোপ এবং নিজেদের এ্যাবট বা মঠাধ্যক্ষ ব্যতীত ক্লুনি অন্য কারুর কর্তৃক স্বীকার করবে না। ধর্মসম্পর্কবিহীন শাসক ও সামন্তদের শাসন থেকে ক্লুনি মঠের স্বাধীনতা রক্ষা করার কথা বলে। ক্লুনির আদর্শ অনুসারে মঠের নিজস্ব বিচারালয় গড়ে ওঠে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামন্ত প্রভুদের ক্লুনির নিয়ম অনুসারে গঠিত মঠগুলির স্বাধীনতা মেনে নিতে হয়েছিল।

## (গ) পদে অধিষ্ঠান

সামন্তযুগের আবহাওয়ায় মঠগুলিও সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারত না। সামন্তযুগে রাজা বা ভূমির মালিক প্রজাকে এই শর্তে জমি দিত যে, প্রয়োজনের সময় প্রজা রাজা বা ভূমির মালিকের স্বপক্ষে যুদ্ধ করবে। প্রজার নিকট হতে শপথ ও আনুগত্য লাভ করে ভূম্যধিকারী প্রজাকে বিশেষ পদ বা জমি দিত। বিশেষ পদে অধিষ্ঠান ও ভূমিদান উপলক্ষে উৎসব হত। উৎসবের সময় ভূমির মালিক প্রজাকে পদদান বা ভূমিদানের প্রতীক হিসাবে পতাকা, অথবা তলোয়ার, অথবা গাছের ডাল বা বড় এক চাপড়া মাটি দিত।

মধ্যযুগে চার্চগুলিও ছিল ক্ষমতাবান সামন্তপ্রভু। ইউরোপের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কৃষিকাজের উপযুক্ত জমির মালিক ছিল চার্চ। চার্চ-এর বিশিষ্ট পদাধিকারী যাজকগণ যেমন আর্চবিশপ, বিশপ এবং এ্যাবট বা মঠাধ্যক্ষ জমিদার ও অন্যান্য সামন্তপ্রভুদের মতই আরাম ও বিলাসের জীবন যাপন করতেন। সাধারণ সামন্ত-প্রভুদের মতই চার্চ তার বিশাল ভূ-সম্পত্তি রক্ষা করার দায়িত্ব শক্তিশালী প্রজাদের উপর এই শর্তে ন্যস্ত করত যে, চার্চ-এর জমি-ভোগকারী প্রজারা প্রয়োজনের সময় চার্চ-এর স্বপক্ষে অস্ত্রধারণ করবে। জমি সম্পর্কে সাধারণ সামন্তগণ যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, চার্চও সেসব সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হবে। সামন্তযুগের রীতি

অনুসারে জমি গ্রহণকারী প্রজারা চার্চ-এর প্রতি তাদের আনুগত্যের শপথ নিত।

এই নিয়োগের পিছনে রাজার যুক্তি ছিল যে, চার্চ যখন সাধারণ সামন্তদের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, তখন চার্চ-এর প্রধান প্রধান পদে যাজক নিয়োগের ক্ষমতা রাজার রয়েছে। পূর্বে অনেক সময় রাজা চার্চ-এর বিশপ, এ্যাবট প্রভৃতি নিয়োগ করতেন। ১০৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হিল্ডেব্রাণ্ড সপ্তম গ্রেগরী নাম নিয়ে পোপ হন। পোপ সপ্তম গ্রেগরী দৃঢ়ভাবে যাজক নিয়োগে রাজার কর্তৃত্বে আপত্তি জানান। এই নিয়ে রাজা এবং পোপের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হয়। বিরোধটি রাষ্ট্র বনাম পোপের বিরোধের রূপ নিয়ে পশ্চিম ইউরোপে প্রায় ২৫০ বৎসর স্থায়ী ছিল।

## (ঘ) একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দী

সেণ্ট বেনেডিক্ট-এর আশ্রম ধর্ম, শার্লামেন-এর শিক্ষা-সংস্কার, ক্লুনির জ্ঞানসাধনা ইত্যাদির ফলে ইউরোপে বিদ্যাচর্চার দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। একাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান সাধনার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সময় ইতালীর অধ্যাপিকাগণ যুক্ত ছিলেন। ট্রটুলা নামে একজন মহিলা সালের্নো বিদ্যালয়ে চিকিৎসক ছিলেন। তিনি স্ত্রীরোগ সম্বন্ধে কয়েকটি পুস্তকও রচনা করেছিলেন। এই সময় আরব পণ্ডিতগণ কর্তৃক লিখিত অনেক গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। ফলে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের পক্ষে আরব জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। আরব জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিতিও একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বিদ্যাচর্চার উন্নতির অন্যতম কারণ। একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপ জ্ঞানালোকের যুগে প্রবেশ করল। দ্বাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অবদান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। বিশ্ববিদ্যালয় ছিল উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র। মধ্যযুগে একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের

বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করতে হলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হত। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি হল : (ক) ধর্মতত্ত্ব আইন ও চিকিৎসাবিদ্যা—এই তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটিতে থাকবে, (খ) বিষয়গুলি শিক্ষাদানের জন্য একাধিক অধ্যাপক থাকবে এবং (গ) বিশ্ববিদ্যালয় শুধু স্থানীয় ছাত্রদের জন্য গঠিত হবে না, বিদেশী ছাত্র আকর্ষণের ক্ষমতাও বিশ্ববিদ্যালয়ের থাকবে। ধর্মতত্ত্ব, আইন ও চিকিৎসাবিদ্যা ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষাদান হত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে শিক্ষার্থীগণ মঠ ও গির্জার বিদ্যালয়ে ট্রিভিয়াম এবং কোয়াড্রিভিয়াম-এর শিক্ষা-তালিকা অনুসারে এইসব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করত। সাধারণভাবে মঠের বিদ্যালয়ে যাজকদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল ; গির্জার বিদ্যালয় ছিল সর্বসাধারণের জন্য। ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান হত। ক্রমে ক্রমে কয়েকটি মঠ ও গির্জার বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। যেমন প্যারীর গির্জা-বিদ্যালয় থেকে বিখ্যাত প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হল ইতালীর সালের্নো, বোলোনা, ও রেগ্‌গিও বিশ্ববিদ্যালয় ; ফ্রান্সের প্যারী ও মঁপেলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইংলণ্ডের বিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়

একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর পণ্ডিতদের মধ্যে হার্মান, কন্‌সটেনটাইন, আবেলার্দ, সেভিল-এর জন, চেস্টার-এর রবার্ট, ক্রেমোনার জেরার্ড প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। হার্মান ছিলেন পাদরি। তিনি সুইৎসারল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। গণিত এবং জোতির্বিদ্যায় হার্মান-এর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। **কন্‌সটেনটাইন** ছিলেন উত্তর আফ্রিকার টিউনিসিয়ার অধিবাসী। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কন্‌সটেনটাইন টিউনিসিয়া থেকে ইতালীর মণ্টে কাসিনোতে আসেন এবং সেখানে ধর্মযাজক হন। কন্‌সটেনটাইন গ্রীক বিজ্ঞানের গ্রন্থ আরবী ভাষা থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ল্যাটিন ভাষায়

কতিপয় জ্ঞানসাধক

অনুবাদের ফলে ইউরোপের পণ্ডিতসমাজ গ্রীক বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়। আদেলার্দ ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর ইংরেজ বিজ্ঞানী। তিনি প্রশ্নোত্তর-পদ্ধতি অনুসরণ করে বিজ্ঞান বিষয়ে কৌতূহল সৃষ্টি করতেন। যেমন, শিশু জন্মগ্রহণ করেই হাঁটে না কেন? কেন মাথার সামনের দিকে টাক পড়ে? কেন মানুষের পাঁচ আঙ্গুল সমান নয়—ইত্যাদি। জন এবং রবার্ট ছিলেন গণিতজ্ঞ। জেরার্ড ন্যায়, দর্শন, গণিত, চিকিৎসা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এইসব জ্ঞানসাধকগণ জ্ঞানলাভের জন্য সব রকম কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন। আদেলার্দ জ্ঞানের সন্ধানে ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন, ঈজিপ্ট এবং সিরিয়া ভ্রমণ করেছিলেন।

মঠ এবং গির্জার বিদ্যালয়ে শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠত। ছাত্রসংখ্যার স্বল্পতা এই সম্পর্ক আরও নিবিড় করে তুলত। শিক্ষকের ব্যক্তিগত সুনামের উপর বিদ্যালয়ের সুনাম নির্ভর করত। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নিকট হতে নিদর্শনপত্র সংগ্রহ করে শিক্ষকের বৃত্তি নিতে পারত, অথবা শিক্ষাচর্চা করতে পারত। যাজকদের শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। তবে শিক্ষার্থীদের পক্ষে শিক্ষককে উপহার প্রদান করা ছিল প্রচলিত রীতি। ছাত্রগণ কর্তৃক প্রদত্ত উপহারের অর্থে ও দ্রব্যে শিক্ষকগণ ভালভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারতেন। মধ্যযুগে আমাদের দেশেও পাঠশালা ও চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের পক্ষে শিক্ষককে উপহার প্রদান করার রীতি প্রচলিত ছিল। ক্রমে ক্রমে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অবস্থা এমন হয় যে, এক সময় প্যারী নগরীর মোট জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগই ছিল ছাত্র। স্বাভাবিক ভাবেই এত ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়। ছাত্রসংখ্যার এত বৃদ্ধিও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ। কখনও কখনও ছাত্ররা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করত। এমনকি, সময় সময় তারা শহরের লোকজনদের সঙ্গে পর্যন্ত মারামারি করত। ১২০৯ খ্রীষ্টাব্দে একদল ছাত্র অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিতাড়িত হয়। এই

শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক

বিতাড়িত ছাত্রদল কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করে। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই কেম্ব্রিজ বিদ্যালয় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে আইন, চিকিৎসাবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, ন্যায়শাস্ত্র, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে চর্চার উন্নতি হয়।

আইনশিক্ষার জন্য ইতালীর বেলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছিল। গিদো প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বেলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করেছিলেন। বিচার ও মামলা পরিচালনার জন্য বেলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শব-ব্যবচ্ছেদ প্রচলিত হয়। শব-ব্যবচ্ছেদ প্রথা শল্যচিকিৎসার উন্নতিতে সাহায্য করেছিল।

আইন

সালের্নো বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাবিদ্যার জন্য বিখ্যাত ছিল। অনেকের মতে সালের্নো ইউরোপের সবচেয়ে পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়। বহু মহিলা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসক ও অধ্যাপিকা ছিলেন। সালের্নোতে গ্রীক চিকিৎসা-পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। বেলোনা বিশ্ববিদ্যালয়েও চিকিৎসা-বিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা ছিল।

চিকিৎসাবিদ্যা

ধর্মতত্ত্ব-চর্চার কেন্দ্র ছিল প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন-চর্চারও ব্যবস্থা ছিল। বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও ধর্মতত্ত্ব চর্চা হত।

ধর্মতত্ত্ব

ন্যায়শাস্ত্র ট্রিভিয়াম বা ত্রিপাঠীর তালিকাভুক্ত ছিল। এ্যারিস-টোটল-এর ন্যায়শাস্ত্র প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পড়তে হত। বোয়েথিয়াস এ্যারিস্টোটল-এর ন্যায়শাস্ত্র গ্রীক থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। ক্রেমোনার জেরার্ড ন্যায়শাস্ত্র গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদ করেছিলেন।

ন্যায়শাস্ত্র

হার্মান সঙ্গীতশাস্ত্র আলোচনা করেছেন। তিনি ধ্বনির উত্থান-

পতন বুঝিয়ে দেবার জন্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন উদ্ভাবন করেন। চার্চ-এর উৎসাহে ল্যাটিন ভাষায় পত্রসাহিত্য রচনার উন্নতি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস ছিল না। তবে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে ঘটনার ধারাবিবরণ লিপিবদ্ধ হত। দ্বাদশ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ছিলেন ওরডেরিক। তাঁর রচনা থেকে সমসাময়িক সমাজ, ঘটনা ও ব্যক্তিদের কথা জানা যায়। একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত কাহিনী "রোনাল্ড-এর সঙ্গীত।" দ্বাদশ শতাব্দীতে কাহিনীটি লিপিবদ্ধ হয়। রোনাল্ড ছিলেন শার্লামেন-এর বিশ্বস্ত অনুগামী। স্পেনের বিরুদ্ধে অভিযানে পীরেনীজ পর্বত-উপত্যকায় আরবদের হাতে রোনাল্ড এবং তার সঙ্গীদের মৃত্যু কাহিনীটির বিষয়বস্তু। মধ্যযুগের চারণগণ গান গেয়ে কাহিনীটি শুনিয়ে বেড়াত। দ্বাদশ শতাব্দীতে একজন জার্মান কবি প্রাচীন কাহিনী সংকলন করেন। তাঁর গ্রন্থের নাম নিবেলুনজেনলিয়েড বা মৃতের সঙ্গীত। নিবেলুনজেনলিয়েড গ্রন্থখানিকে জার্মানির ইলিয়াড বলা হয়। এই বইয়ের কাহিনীগুলি আজও জার্মানিতে সমাদৃত। এই সময়ের ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যেরও গোড়াপত্তন হয়েছিল। উত্তর ইউরোপ এবং ব্রিটেনের মধ্যে যোগাযোগ ইংরাজী কাব্য-সাহিত্য রচনাকে অনুপ্রাণিত করে। পরবর্তী কালের ইংরেজী সাহিত্যের কাল্পনিক বীরপুরুষ রাজা আর্থার-এর কাহিনীও এই সময় চারণদের গানে গানে প্রচলিত হয়।

সঙ্গীত-পত্রসাহিত্য-ইতিহাস-সাহিত্য

## অনুশীলন (১)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) শার্লামেন কত বৎসর রাজত্ব করেছিলেন? (২) লিও কে ছিলেন? (৩) কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শার্লামেনকে সবচেয়ে কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল?

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ** শূন্যস্থান পূরণ কর (১) স্যাক্সনরা—রাজ্যের উত্তর-পূর্ব দিকে—এবং এল্‌ব্‌ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাস করত। (২) শার্লামেন আটবার—বিরুদ্ধে অভিযান করেন।

**মানচিত্র বিষয়ক প্রশ্ন ঃ** মানচিত্রে স্যাক্সনদের বাসভূমি প্রদর্শন কর।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) শার্লামেন-এর সামরিক অভিযান বর্ণনা কর। (২) কীভাবে শার্লামেন স্যাক্সনদের পরাজিত করেন ? (৩) লিও কে ? কেন রোমের লোক লিওর বিরোধী হয় ? (৪) শার্লামেন কীভাবে লিওকে সাহায্য করেছিলেন ?

## অনুশীলন (২)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) কোন্ বৎসর পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য গঠিত হয় ? (২) কোন্ গির্জায় পোপ শার্লমেনকে রাজমুকুট পরিয়ে দেন ?

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ** শূন্যস্থান পূরণ কর। বর্তমান—, — —, — এবং— — বৃহৎ অংশ পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

**মানচিত্র বিষয়ক প্রশ্ন ঃ** মানচিত্রে শার্লামেন-এর সাম্রাজ্য প্রদর্শন কর।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা আলোচনা কর। (২) শার্লামেন-এর রাজ্যাভিষেকের গুরুত্ব কী ?

## অনুশীলন (৩)

**বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ** (১) পিটার কে ? (২) থিওডোলফ কে ? (৩) কে শার্লামেন-এর জীবনী রচনা করেছিলেন ? (৪) কে শার্লামেন-এর শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতা ছিলেন ?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) শার্লামেন-এর সঙ্গে চার্চ-এর সম্পর্ক আলোচনা কর। (২) শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক রূপে শার্লামেন-এর রাজসভার ভূমিকা কী ছিল ?

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** কীভাবে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ?

## অনুশীলনী (৪)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) কে আশ্রমধর্ম প্রবর্তন করেন ? (২) সেন্ট বেনেডিক্ট কোথায় মঠ স্থাপন করেছিলেন ? (৩) ট্রিভিয়ামে কী কী বিষয়ে শিক্ষাদান হত ? (৪) কী কী বিষয় কোয়াড্রিভিয়াম-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল ?

**বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ** (১) ক্লুনি কোথায় অবস্থিত ? (২) কত খ্রীষ্টাব্দে ক্লুনিতে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় ? (৩) ক্লুনি একটি সৈন্যদল—কে বলেছিলেন ? (৪) হিল্ডেব্রাণ্ড পোপ রূপে কী নাম গ্রহণ করেছিলেন ?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) খ্রীষ্টীয় মঠের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের জীবনযাত্রা আলোচনা কর। (২) সেন্ট বেনেডিক্ট-এর জীবনী এবং তাঁর আশ্রম-ধর্মের পরিচয় দাও। (৩) বেনেডিক্ট-এর আদর্শ অনুসারে সন্ন্যাসীদের কী শপথ নিতে হত ? (৪) খ্রীষ্টীয় মঠের বিদ্যাচর্চা আলোচনা কর। (৫) ক্লুনি

কীভাবে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়? (৬) ধর্মসংস্কার আন্দোলনে ক্লুনির ভূমিকা কী ছিল?

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** নবম শতাব্দীর খ্রীষ্টীয় মঠের বিদ্যাচর্চা আলোচনা কর। ক্লুনি বিখ্যাত কেন?

## অনুশীলনী (৫)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) সামন্তযুগে কীভাবে ভূমিদান ও পদদান অনুষ্ঠান হত? (২) সামন্তপ্রভু হিসাবে চার্চ-এর ভূমিকা আলোচনা কর। (৩) কীভাবে প্রধান যাজক নিয়োগের প্রশ্নটি রাষ্ট্র বনাম পোপ-এর বিরোধের রূপ নিল?

## অনুশীলনী (৬)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) ট্রুটুলা কে? (২) ট্রুটুলা কোথাকার চিকিৎসক ছিলেন?

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ** শূন্যস্থান পূরণ কর। দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হল ইতালীর—, ও — বিশ্ববিদ্যালয়; ফ্রান্সের — ও — বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইংলণ্ডের বিখ্যাত — বিশ্ববিদ্যালয়।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) মধ্যযুগে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। (২) কীভাবে মঠ ও গির্জার বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়?

## অনুশীলনী (৭)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর কয়েকজন জ্ঞানসাধকের পরিচয় দাও। (২) একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক আলোচনা কর।

## অনুশীলনী (৮)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) কোন্ কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মতত্ত্ব চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল? (২) কোন্ গ্রন্থকে জার্মানির ইলিয়ড বলা হয়? (৩) 'রোনাল্ড-এর সঙ্গীত' আলোচনা কর।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** আলোচনা কর—একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর (ক) আইন ও চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা (খ) ধর্মতত্ত্ব ও ন্যায়শাস্ত্র চর্চা (গ) সঙ্গীত ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চা।

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের বিদ্যাচর্চা আলোচনা কর।

## (ক) সামন্ততন্ত্র

একাদশ শতাব্দী আরম্ভ হতে না হতেই ইউরোপে প্রায় সর্বত্র সমান্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠার অর্থ ইউরোপের প্রায় সব জমি সামন্তপ্রভুদের হস্তগত হয়েছিল এবং যারা পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করে, তারা সম্পূর্ণভাবে সামন্তপ্রভুদের উপর নির্ভরশীল হ'য়ে পড়েছিল। মধ্যযুগের সমাজ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। মধ্যযুগের অর্থনীতি সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি বা তালুককে ইংলণ্ডে ম্যানোরিয়াল এস্টেট, রাশিয়াতে ভোতচিনা এবং ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য স্থানে সিনিওরী বলা হয়।

জমি ও মানুষে মানুষে সম্পর্ক

মধ্যযুগে ঐশ্চর্য ও সম্পদের প্রধান সূত্র ছিল জমি। জমি মানে শুধু চাষের জমি নয়। অনাবাদী জমি, পতিত জমি, পুকুর, বন-জঙ্গল, পশুচারণ ভূমি, নদী সবই জমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মধ্যযুগে জমিই একজন মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের সম্পর্ক নির্ধারিত করত। জমির পরিমাণ অনুসারে কেউ হত ডিউক, কেউ আর্ল, কেউ ব্যারন, কেউ নাইট। এরা সবাই ছিল জমির মালিক। ভূমিদাস বা সার্ফ মালিকদের জমি চাষ করে, তাদের সেবা করে জীবন কাটাত।

উঁচু মহলের কাঠামো

সামন্ততান্ত্রিক উঁচু মহলের কাঠামোতে সবার উপরে ছিল রাজা। রাজা দেশের সমস্ত জমির মালিক। রাজার নিচে স্থান ছিল ডিউক এবং আর্লদের। রাজা শত শত গ্রাম ডিউক এবং আর্লদের মধ্যে বণ্টন করত। গ্রাম বণ্টনের শর্ত ছিল যে, যুদ্ধের সময় ডিউক এবং আর্লরা রাজার পক্ষে অস্ত্রধারণ করবে, সৈনিক ও অস্ত্র দিয়ে রাজাকে সাহায্য করবে। ডিউক এবং আর্লদের অধীনে বহু সৈনিক থাকত। ব্যারনরা ছিল ডিউক ও আর্লের নিচে। একজন ব্যারন সাধারণত কুড়ি থেকে ত্রিশটি গ্রামের মালিক হত। যুদ্ধে সাহায্য করবে এই একই

শর্তে ব্যারনরা ডিউক এবং আর্লদের নিকট হতে গ্রাম লাভ করত। ব্যারনের নিচে ছিল নাইট। নাইটরা শুধু ধনী জমিদার ছিল না, তারা ছিল অশ্বারোহী যোদ্ধা। রাজা, ডিউক, আর্ল, ব্যারন এবং নাইটরা ছিল সামন্তদের উঁচু মহলের কাঠামো এবং সমাজের অভিজাত শ্রেণী। অন্য শ্রেণী ছিল সার্ফ—যারা শোষিত ও নির্যাতিত।

সর্বসাধারণের সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা

অভিজাত শ্রেণী শুধু জমি নয়, সর্বসাধারণের ভোগ্য সম্পত্তির উপরও ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেছিল। সর্বসাধারণের ভোগ সম্পত্তি বলতে বুঝায় নদীর জল, পশুচারণ-ভূমি, বিশাল প্রান্তর, বনাঞ্চল ইত্যাদি। নবম-দশম শতাব্দীর মধ্যেই ইউরোপের ভূস্বামীরা সর্ব-সাধারণের ভোগ্য এইসব সম্পত্তি নিজেদের অধিকারে নিয়ে এসেছিল। তবে কৃষকগণ তাদের সামন্তপ্রভুদের অনুমতি নিয়ে নদীর জল, পশুচারণভূমি, প্রান্তর, বনাঞ্চল ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারত।

মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠেছিল। একমাত্র জর্মানিতেই এরকম ছোট ছোট রাজ্যের সংখ্যা ছিল প্রায় দু-শ। আসলে এই রাজ্যগুলি ছিল সামন্তপ্রভুদের জমিদার বা এলাকা। সামন্তগণ প্রায় স্বাধীনভাবে চলত। তাদের নিজস্ব দুর্গ ও সৈন্যবাহিনী ছিল। প্রায়ই সামন্তপ্রভুগণ একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করত। সাধারণভাবে যুদ্ধের কারণ ছিল অন্যের জমি এবং সার্ফদের উপর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

দুর্গ

দুর্গগুলি পাহাড়ের চূড়ায় অথবা দুরারোহ পাহাড়ের উপর নির্মিত হত। সামন্তপ্রভু তার পরিবারের লোকজন নিয়ে দুর্গের মাথায় নিরাপদ আশ্রয়ে বাস করত। প্রথমদিকের দুর্গগুলি ছিল কাঠ দিয়ে তৈরী। পরবর্তীকালে পাথর দিয়ে দুর্গগুলি নির্মিত হত। দুর্গের চারদিক ঘিরে জলপূর্ণ পরিখা থাকত। দুর্গের দরজার সামনে পরিখার উপর থাকত সেতু। রাত্রিবেলা এবং শত্রুর আক্রমণের সময় সেই সেতু তুলে রাখা

হত। দুর্গের বাইরের প্রাচীরের অভ্যন্তরে আরও একটি প্রাচীর থাকত। ভিতরের প্রাচীরটি ছিল খুব মজবুত। শত্রুপক্ষ দুর্গ আক্রমণ করলে দুর্গের ভিতরের সৈনিকগণ প্রাচীরের উপর থেকে শত্রুর প্রতি কাঠের গুঁড়ি, পাথর গরম জল, বর্শা, তীর ইত্যাদি নিক্ষেপ করত। দুর্গের মধ্যে ভূগর্ভের কুঠিতে যুদ্ধবন্দী ও বিদ্রোহী কৃষকদের রাখা হত। দুর্গ থেকে পলায়ন করিয়াও গোপন সুড়ঙ্গপথ



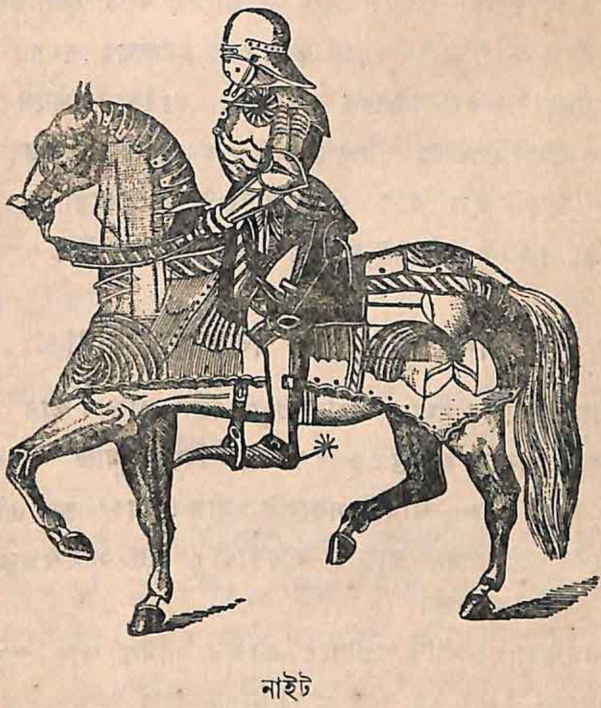
দুর্গ

ছিল। তখনকার দিনের যুদ্ধের কৌশল অনুযায়ী শত্রুপক্ষ দীর্ঘকাল ধরে দুর্গ অবরোধ করে রাখত। অবরোধের সময় দুর্গে যাতে খাদ্যের

অভাব না হয় সেজন্য দুর্গের ভিতরে প্রচুর খাদ্য মজুত করা হত। পানীয় জলের জন্য দুর্গের ভিতরে কূপ থাকত।

সামন্তযুগের বর্মাবৃত অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিল একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বর্মাবৃত অশ্বারোহী যোদ্ধাদের 'নাইট' বলা হত। এইসব যোদ্ধারা লোহার জালি দিয়ে তৈরী জামা পরিধান করত, তাদের মাথায় থাকত শিরস্ত্রাণ। ধাতুর আচ্ছাদনের সাহায্যে তারা যুদ্ধের সময় চোখ ও মুখ রক্ষা করত। বর্মাবৃত অশ্বারোহী যোদ্ধারা সোজা তলোয়ার ও লম্বা বর্শা দিয়ে যুদ্ধ করত। তারা খুব বড় ঢাল ব্যবহার করে মাথা থেকে পা পর্যন্ত রক্ষা করতে পারত। যোদ্ধাদের অশ্বগুলিও বর্মের সাহায্যে রক্ষা করা হত। এমন বর্মে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ করা সহজ নয়। তাই নাইটরা অল্প বয়স থেকেই অশ্বপৃষ্ঠে বর্মসজ্জিত হয়ে

বর্মাবৃত অশ্বারোহী যোদ্ধা



নাইট

যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করত। লোহার অস্ত্র, বর্ম ইত্যাদি তৈরি ছিল খুব ব্যয়সাধ্য। সেজন্য সমাজের ধনী শ্রেণীর লোকেরাই বর্মাবৃত অশ্বারোহী

যোদ্ধা হতে পারত। সৈনিকের বৃত্তি ছিল অত্যন্ত সম্মানের। সৈনিক এবং নাইট ছিল সমার্থক শব্দ।

শুধু শত্রুপক্ষের আক্রমণ ও অবরোধ হতে নিরাপদে থাকার জন্য সামন্তযুগের দুর্গগুলি নির্মিত হয় নি। এই দুর্গ ও বর্মাবৃত অশ্বারোহী যোদ্ধারা ছিল মধ্যযুগের ইউরোপের রক্ষাকর্তা। ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা দুর্গ নির্মাণ করে তাঁদের রাজ্য রক্ষা করতেন। এমন করেই "বিজয়ী উইলিয়ম" নামে খ্যাত ইংলণ্ডের রাজা ইংলণ্ডের উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজা চতুর্থ হেনরী দুর্গ নির্মাণ করে স্যাক্সনির উপর রাজকীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের ডিউকগণ দুর্গের সাহায্যে নিজ নিজ এলাকা রক্ষা করতেন। ইউরোপের রাজাদের নাইট বা বর্মাবৃত অশ্বারোহী যোদ্ধারা তাদের রাজাদের পক্ষে যুদ্ধ করে রাজ্য রক্ষা করত। ইউরোপীয় চার্চ ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের সময় নাইটদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করেছিল। নাইটদের ঐশ্বর্য ও শৌর্য পশ্চিম ইউরোপের বহু ব্যক্তিকে বর্মাবৃত অশ্বারোহী যোদ্ধার জীবিকা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ক্রুসেডের সময় ইউরোপের রাজাদের অপেক্ষা চার্চ-এর অধীনেই নাইটদের সংখ্যা ছিল বেশী।

দুর্গ ও বর্মাবৃত অশ্বারোহী যোদ্ধা —ইউরোপের রক্ষাকর্তা

## সামন্ততন্ত্র—একটি স্বতন্ত্র জীবনধারা

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সবার প্রথমে ছিল রাজার স্থান। ডিউক এবং আর্ল প্রভৃতি সামন্তপ্রভুগণ রাজাকে বিশেষ মান্য করতে চাইত না। তারা বলত—আমরা সকলেই সমান; রাজা শুধু এই সমান ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম স্থানের অধিকারী। বহু সামন্তপ্রভুই রাজা হবার সুযোগ খুঁজত।

সামন্ততান্ত্রিক রীতি অনুসারে একজন সামন্ত তার প্রভুর প্রতি কর্তব্যপালন করবে এই শর্তে প্রভুর নিকট হতে জমি লাভ করত। কর্তব্য পালন প্রধানত ছিল জমিদানকারী প্রভুর স্বপক্ষে যুদ্ধ করা। প্রত্যেক সামন্তের এলাকা ছিল প্রায় স্বাধীন। এই প্রায়-স্বাধীন

এলাকার মধ্যে বসবাসকারী লোকেরা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করত। জীবনধারণের উপযোগী প্রায় সবকিছুই এলাকার মধ্যে উৎপন্ন হত। এক এলাকার লোকেদের পক্ষে অন্য এলাকায় যাবার প্রয়োজনই হত না। ছোট ছোট সামন্ত এলাকায় বিভক্ত হওয়ার ফলে সামন্ততন্ত্র ইউরোপে. বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপে রাজনৈতিক অনৈক্য সৃষ্টি করেছিল। কখনও কখনও একজন সামন্তপ্রভুর এলাকা এত ছোট হত যে লোকে পরিহাস করে বলত—প্রভু যখন ঘুমান তখন তার মাথা নিজের জমিতে থাকে বটে, কিন্তু পা চলে যায় অন্যের জমিতে।

সামন্ততান্ত্রিক নিয়ম অনুযায়ী একজন সামন্ত ঠিক তার উপরের সামন্তপ্রভুর আদেশ মানতে বাধ্য ছিল, কিন্তু তার প্রভুর যে প্রভু তার আদেশ মানতে বাধ্য ছিল না। যেমন একজন নাইট তার ব্যারন-এর আদেশ মানবে, কিন্তু রাজার আদেশ মানতে বাধ্য নয়। রাজা যখন যুদ্ধ ঘোষণা করত তখন ডিউক এবং আর্লদের আহ্বান করত, ডিউক এবং আর্লগণ ব্যারনদের আহ্বান করত এবং ব্যারনগণ নাইটদের আহ্বান করত। এভাবে সামন্ততান্ত্রিক সৈন্যবাহিনী গঠিত হত। সামন্তপ্রভুগণ তাদের অধীনে সামন্তদের বিপদ থেকে রক্ষা করত। যদি কোনো সামন্তদের বিরুদ্ধে কৃষকরা বিদ্রোহ করত, সামন্তপ্রভু সংবাদ পেলেই সৈন্য পাঠিয়ে সেই সামন্তকে সাহায্য করত।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের রাজা, ডিউক, আর্ল, ব্যারন এবং নাইটদের নিয়ে গঠিত উঁচুমহল নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করত। এই সামন্তশ্রেণী একে অন্যকে সাহায্য করে কৃষকশ্রেণীকে দাবিয়ে রাখত। সামন্তদের অত্যাচার থেকে কৃষকদের রক্ষা করার কোন ব্যবস্থাই ছিল না।

মধ্যযুগের সামন্তপ্রভুগণ শিক্ষা এবং সংস্কৃতি অপেক্ষা শারীরিক শক্তিচর্চাকেই বেশী মর্যাদা দিত। যুদ্ধ, শিকার এবং টুর্নামেণ্ট ছিল তাদের জীবনযাত্রার অঙ্গ। দু-জন বর্মাবৃত অশ্বারোহী ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রতিযোগিতাকে 'টুর্নামেণ্ট' বলা হত।

টুর্নামেণ্ট

এই প্রতিযোগিতায় নাইটদের শক্তি ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যেত। টুর্নামেণ্ট দেখার জন্য অভিজাত শ্রেণীর

লোকজন ব্যতীত বহু সাধারণ লোকও টুর্নামেণ্ট-এর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হত। টুর্নামেণ্টে দু-জন প্রতিদ্বন্দ্বী বর্মসজ্জিত হয়ে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করত। বর্শার সাহায্যে একে অন্যকে অশ্বপৃষ্ঠ হতে ফেলে দেওয়া ছিল আক্রমণের উদ্দেশ্য। যে প্রতিযোগী তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে অশ্বপৃষ্ঠ হতে ফেলে দিতে পারত, সে টুর্নামেণ্ট-বিজয়ী ঘোষিত হত। টুর্নামেণ্ট-বিজয়ী নাইট পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘোড়া এবং বর্মা পুরস্কার পেত। অনেক সময় এই প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বী নাইটগণ গুরুতররূপে আহত হত। কখনও বা কারুর মৃত্যু পর্যন্ত হত। যুদ্ধ, শিকার এবং টুর্নামেণ্টে পারদর্শী হলেও অভিজাত বলে পরিচিত বহু ব্যক্তিই সামান্য লেখাপড়াও জানত না। এমন কি, অনেক অভিজাত ব্যক্তি নিজের নাম পর্যন্ত লিখতে পারত না। তথাপি বিপুল জমিজমার অধিকারী হয়ে তারা সাধারণ লোকদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত।

সাধারণ লোকের অধিকাংশই ছিল কৃষক এবং গ্রামের অধিবাসী। সে সময় কিছু কিছু শহর গড়ে উঠেছিল। তবে গ্রামের লোকসংখ্যাই ছিল বেশী। দ্বাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে শহরের অধিবাসী অপেক্ষা নয় গুণ বেশী অধিবাসী গ্রামে বাস করত। শহরের মানুষ তাদের খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসের জন্য গ্রামের উপর নির্ভর করত। তারা গ্রাম থেকে এইসব জিনিস কিনত। ফলে শহরের অর্থ গ্রামে আসত। অর্থের বেশীর ভাগই গ্রামের সামন্তপ্রভুরা পেত। তারা এই অর্থের সাহায্যে যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাত এবং বিলাসপূর্ণ জীবনযাপন করত। মধ্যযুগে জীবনযাত্রার অনেকখানি উন্নতি হয়েছিল। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কৃষির জন্য অতিরিক্ত জমির প্রয়োজন হয়। সমুদ্র ও জলাভূমি থেকে এবং বনাঞ্চল আবাদ করে এই অতিরিক্ত জমি সংগৃহীত হয়েছিল। স্থলপথ ব্যতীত নদী ও সমুদ্রপথে বাণিজ্য হত। তবে জলে ও স্থলে দস্যুরা সুযোগ পেলেই বাণিজ্য-দ্রব্য লুণ্ঠন করত।

কৃষিজমি বৃদ্ধি

বীরধর্ম বা 'শিভল্‌রি' ছিল অভিজাত সামান্তশ্রেণীর একাংশের

জীবনধারার অঙ্গ। যুদ্ধে বীরত্ব, ধর্মে নিবেদিত প্রাণ এবং রমণীদের সম্মানরক্ষায় সদা-প্রস্তুত,—বীরধর্ম ছিল এই তিনটি গুণের সমাবেশ। একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে বীরধর্মের সূচনা হয়। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী বীরধর্মের চরম বিকাশকাল। বীরধর্মের মূলকথা ছিল সেবা,—সামন্তপ্রভুর সেবা, ঈশ্বরের সেবা, এবং প্রিয় ও পরিচিত নারীর সেবা। নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কোনরকম মূল্য বা পুরস্কার আশা না করে, সেচ্ছায় সেবাধর্ম পালন করতে হবে। ইউ-রোপের নাইটগণ ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ধর্ম ও যুদ্ধ বীর-ধর্মের এই দু-টি প্রধান বৈশিষ্ট্যের মিলন ঘটিয়ে ছিল। মাতা মেরীর উপাসনার মধ্য দিয়ে নাইট-গণ ধর্ম এবং রমণীদের প্রতি শ্রদ্ধা—বীরধর্মের এই দু-টি বৈশিষ্ট্যের মিলন ঘটায়। ক্রুসেডে যোগদানকারী নাইটদের মধ্যে মাতা মেরীর উপাসনা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বীরধর্মের অন্তর্ভুক্ত গুণাবলী ছিল সাহসিকতা, আনুগত্য, বিনয়, ভদ্রতা, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, আহত ও দুর্বল ব্যক্তিকে রক্ষা, খ্রীষ্টীয় চার্চ ও খ্রীষ্টধর্মকে রক্ষা ইত্যাদি। বীরধর্মের এই সব গুণাবলী যে সমস্ত নাইটদের মধ্যে দেখা যেত, তা নয়। কিন্তু বীরধর্মের এই আদর্শ সে যুগের জীবনবোধকে উন্নত করেছিল। কোন কোন নাইট বীরধর্মের অন্তর্ভুক্ত বহু গুণের অধিকারী হতে সক্ষম হয়েছিল। এইসব নাইট তাদের জীবনে শৌর্য সাহসের সঙ্গে বিনয়, ভদ্র ব্যবহার ও সেবার মিলন ঘটিয়েছিল।

বীরধর্ম

মধ্যযুগে দক্ষিণ ফ্রান্সে একদল কবি ও গায়কের আবির্ভাব হয়। এই কবি ও গায়কদের ত্রুবাদুর বলা হত। ত্রুবাদুরগণ গীতিকবিতা রচনা করত এবং প্রাসাদ ও অভিজাতদের গৃহে গান গাইত। ত্রুবাদুরদের রচিত গীতিকবিতা এবং গানের বিষয় ছিল ধর্মযুদ্ধ বা অন্য কোন যুদ্ধ, নাইটদের বীরত্ব, রমণীদের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি। সে যুগের দু-জন বিশিষ্ট ত্রুবাদুর ছিলেন বার্ট্রাণ্ড এবং জিরড। বার্ট্রাণ্ড-এর গীতিকবিতার বিষয় ছিল যুদ্ধ। জিরড-এর গীতিকবিতার বিষয় ছিল ভালবাসা। অভিজাত

ত্রুবাদুর

সমাজের মহিলা, এমন কি ফ্রান্সের রাণী ইলিয়ানর প্রমুখ মহিলাগণও ক্রবাদুরের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

## (খ) "ম্যানরীয় পদ্ধতি"

মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের খাস জমিদারিকে "ম্যানর" বলা হত। এই ধরনের জমিদারি ব্যবস্থা "ম্যানরীয়" পদ্ধতি নামে পরিচিত। জমি ভোগদখলের শর্তের উপর "ম্যানরীয়" পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল। ম্যানরীয় পদ্ধতি সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক ও শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র রূপ গ্রহণ করেছিল। একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংলণ্ড নর্মানদের দ্বারা বিজিত হয়। নর্মান-বিজয়ের পর ইংলণ্ডে "ম্যানরীয়" পদ্ধতির সর্বোচ্চ বিকাশ হয়। নর্মান শাসনকালে ইংলণ্ডের রাজা ও সামন্তপ্রভুদেব জমিজমার হিসাব সুস্পষ্টভাবে 'ডুমস্‌ডে বুক' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। অবশ্য "ম্যানরীয়" পদ্ধতিতে পরিচালিত রাশিয়ার জমিদারিগুলিতেই কৃষকদের দুর্দশা ছিল সর্বাধিক।

ম্যানরীয় নীতি

মধ্যযুগের ইউরোপের রাজা, জমিদার, চার্চ, সামরিক নেতা ও জমির অন্যান্য মালিকরা প্রচুর জমি ভোগ করত। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে যে "ম্যানরীয় ব্যবস্থা বা জমিদারী গড়ে উঠত তার মাঝখানে থাকত জমির মালিকের বাসগৃহ। জমির মালিক তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যতখানি জমি প্রয়োজন ততখানি জমি রেখে দিত। অবশিষ্ট জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হত। কৃষকরা জমির মালিকের কাজ করে দেবে এই শর্তে জমি পেত। কৃষিকাজ ছাড়াও বন পরিষ্কার, বাগান ও বাগিচা নির্মাণ, মৎস্য চাষ, মদ্য প্রস্তুত, মক্ষিকা পালন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্মাণ ইত্যাদি সামন্ততান্ত্রিক যুগের অর্থনৈতিক কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জমির মালিকের এলাকার অন্তর্ভুক্ত ঝরনা, নদী, সরোবর ইত্যাদিও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা হত। সাধারণত একজন জমির মালিক ন-শ থেকে বারো-শ বিঘা জমি

অর্থনৈতিক রূপ

ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য রাখত। জমির মালিক তার অবশিষ্ট জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করত। একজন কৃষক কিন্তু তার চাষের জমি একসঙ্গে একই জায়গায় পেত না। জমির মালিকের কাছ থেকে সে যে জমি পেত তা গ্রাম বা তালুকের বিভিন্ন অংশে ছড়ান থাকত। ভিন্ন ভিন্ন কৃষকের জমি আলাদাভাবে আল বা বেড়া দিয়ে ভাগ করা হত না। বিভিন্ন জীবিকার লোকদের মধ্যে ছিল কৃষক, মৎস্যজীবী, মক্ষিকা-পালক, কর্মকার, তন্তুবায় ইত্যাদি। গ্রামবাসীরা বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করতে পারত তবে বনে শিকারের অধিকার ছিল একমাত্র জমির মালিকের।

অর্থনীতির দিক থেকে "ম্যানর"-গুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। অর্থাৎ এক-একটি "ম্যানর"-এর অধিবাসিগণ তাদের খাদ্য ও জীবিকার জন্য অন্য "ম্যানর"-এর উপর নির্ভর করত না। কখনও কখনও হাজার হাজার গ্রাম বড় বড় "ম্যানর" বা জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য অল্প সংখ্যক গ্রাম নিয়ে গঠিত ছোট ছোট "ম্যানর"ও থাকত। কিন্তু ছোট বড় সব "ম্যানর"-এর অর্থনীতিই ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষকরা ফসল ফলাত। অতিরিক্ত ফসল সামন্তপ্রভুর শস্যাগারে জমা হত। ফসল উৎপাদন ব্যতীত কৃষকরা নিজেদের বাড়ি বানাত, নিত্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র নির্মাণ করত, বস্ত্র বয়ন করত, এমন কি তাদের জুতাও তৈরি করত। সামন্তপ্রভু বা "ম্যানর"-এর মালিক তার এলাকার মধ্যে কর্মশালা স্থাপন করে কারিগরদের দিয়ে যুদ্ধাস্ত্র, বর্ম, অশ্বাদি পশুর সাজ ইত্যাদি নির্মাণ করাত। কখনও কখনও "ম্যানর"-এর অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে বাইরের লোক পশরা নিয়ে আসত। তারা আনত রেশমের জামা-কাপড়, মূল্যবান প্রস্তর, অন্যান্য বিলাস-সামগ্রী। কিন্তু এ সব দামী জিনিস কেনার ক্ষমতা কৃষক বা সাধারণ লোকেদের ছিল না। "ম্যানর"-এর মালিকের প্রচুর জমিজমা থাকলেও নগদ অর্থ বেশী থাকত না। তাই সে তার অতিরিক্ত ফসল বিক্রী করে রেশম, প্রস্তর, বিলাসদ্রব্য ইত্যাদি সংগ্রহ করত। মধ্যযুগের ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক গ্রামগুলিতে লোকের প্রয়োজনও ছিল সামান্য। তবু

যে দুটি জিনিসের অভাব তারা খুব বোধ করত তা হল লোহা এবং লবণ। জমির মালিক এবং কৃষক উভয়েই শস্যের বিনিময়ে "ম্যানর"-এর বাইরে যে সব স্থানে এই জিনিস পাওয়া যায় সে সব স্থান থেকে লোহা এবং লবণ সংগ্রহ করত। এভাবে "ম্যানরীয়" অর্থনীতিতে বিনিময় প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। সে যুগে "ম্যানর"গুলিতে নগদ অর্থের প্রচলন ছিল খুবই কম।

"ম্যানরীয়" জমিদারি ছিল সামন্ততান্ত্রিক শাসনের স্থানীয় কেন্দ্র। সামন্ততান্ত্রিক শাসনের স্থানীয় কেন্দ্ররূপে "ম্যানর" যুদ্ধের সময় দেশ ও "ম্যানর" অঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব নিত। "ম্যানর"-এর মালিক সৈন্য ও অর্থ দিয়ে তার উপরস্থ সামন্ত-প্রভুকে সাহায্য করত। রাস্তা ও সেতু নির্মাণ, দুর্গ রক্ষা ইত্যাদি প্রশাসন কার্যের দায়িত্ব "ম্যানর"-এর মালিককে নিতে হত। এছাড়া "ম্যানর"-গুলিতে আদালত বা কাছারি থাকত। জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদ দেখা দিলে "ম্যানর"-এর আদালত বিবাদ নিষ্পত্তি করত। সাধারণত স্থানীয় প্রচলিত রীতি অনুসারে "ম্যানর" আদালত বিবাদ মীমাংসা করত। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে "ম্যানর" আদালত দেশের সর্বসাধারণের জন্য প্রণীত আইন অনুযায়ীও বিচার করতে পারত।

শাসন কেন্দ্র—
"ম্যানর" আদালত

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। বহু বনাঞ্চল পরিষ্কার করে চাষবাস আরম্ভ হয়। কৃষকরা অনেক জলাভূমিও চাষের জমিতে পরিণত করে। এভাবে ইউরোপে প্রচুর বন ও জলাভূমি কৃষিভূমিতে পরিণত হয়। এ সময় কৃষিকার্যে সারের ব্যবহারও আরম্ভ হতে থাকে। ফলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শুধু মানুষের খাদ্যের প্রয়োজনই মেটাল না। বেশী ফসল উৎপাদনের ফলে গবাদি পশুর খাদ্যও বৃদ্ধি পেল। কৃষক চাষের জন্য অধিক সংখ্যক গরু, ঘোড়া ইত্যাদি রাখতে পারল। পূর্ব ইউরোপে নাইট ও যোদ্ধাগণ ঘোড়া ব্যবহার করত। গবাদি পশুর খাদ্যে প্রাচুর্য আসার ফলে কৃষকগণও কৃষিকাজ এবং মাল পরিবহণের জন্য

অর্থনৈতিক অবস্থা

ঘোড়া ব্যবহার করতে আরম্ভ করল। এ সময় লোহা ও অন্যান্য ধাতু দ্বারা নির্মিত যন্ত্রপাতি কৃষিকার্যের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে। এর ফলেও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে সামন্তপ্রভুরা এখন থেকে শুধু সুতার বস্ত্রই পরত না। তারা ভেড়ার লোম থেকে তৈরী পশমের পোশাকও পরতে আরম্ভ করল।

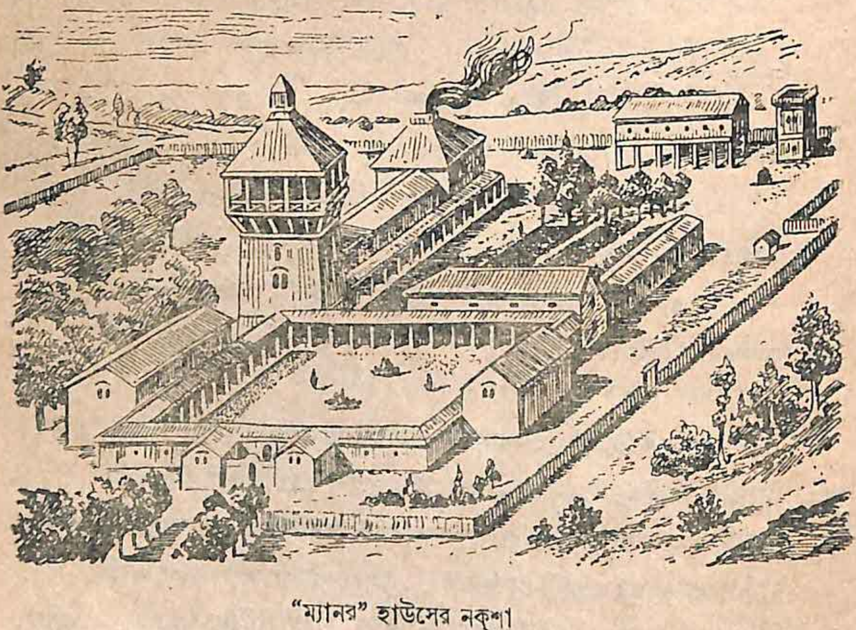
দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে কৃষিকার্যই ছিল অধিক সংখ্যক লোকের জীবিকা। পাহাড় অঞ্চলের অধিবাসীরা অবশ্য পশুপালন করত। কিছু সংখ্যক লোক আঙ্গুর ও জলপাই ক্ষেতে কাজ করত। তথাপি বেশির ভাগ মানুষই করত চাষ-আবাদ।

সকলে মিলে চাষ

গ্রামের কৃষকগণ সকলে একসঙ্গে জমিতে কাজ করত। সে সময় জমি বণ্টনের ব্যবস্থাই এমন ছিল যে, সকলকে একত্রে চাষ করতে হত। উত্তর ইউরোপের গ্রামগুলিতে ভারী চাকার লাঙ্গল দিয়ে চাষের প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। ভারী চাকা সহজে ঘুরান যায় না। সেজন্য উত্তর ইউরোপের চাষের জমি ছিল লম্বা লম্বা—আয়তক্ষেত্রাকার; ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলের চাষের জমি ছিল বর্গক্ষেত্রের মত। কারণ এই অঞ্চলে ব্যবহৃত লাঙ্গলগুলি ছিল হালকা। লাঙ্গলগুলি সহজেই জমিতে ঘুরান যেত।

উত্তর ইউরোপের চাষের পদ্ধতির সঙ্গে দক্ষিণ ইউরোপের চাষের পদ্ধতির পার্থক্য ছিল। উত্তর ইউরোপে জমি তিন ভাগে চাষ হত। শীতকালে এক ভাগে গম (সাধারণত অবস্থাপন্ন শ্রেণীর জন্য) অথবা রাই (কৃষকদের জন্য) চাষ হত। বসন্তকালে এক ভাগ জমিতে যব, ওট ইত্যাদি চাষ হত। জমির তৃতীয় ভাগ পতিত থাকত। দক্ষিণ ইউরোপে জমি চাষ হত দু-ভাগে। অর্ধেক জমিতে কৃষিকার্য হত এবং অর্ধেক জমি পতিত থাকত। পতিত জমি পরের বৎসর চাষ হত। জমি পতিত রাখার কারণ ছিল এই যে, ক্রমাগত চাষের ফলে জমির উর্বরা-শক্তি যেন ক্ষয় না হয়।

একজন কৃষক তার চাষের সব জমি ভূমির মালিকের কাছ থেকে একত্রে লাগান অবস্থায় পেত না। তার সব জমি আবার সবটাই ভাল জমি ছিল না। ভূমির মালিক কৃষককে চাষের জন্য যে জমি দিত সে জমি ভালমন্দ মিশিয়ে থাকত এবং মালিকের এলাকার বিভিন্ন মাঠে ছড়ান থাকত। এভাবে প্রত্যেক কৃষকই কিছু ভাল জমি এবং কিছু খারাপ জমি চাষের জন্য পেত। এইসব জমিতে চাষের জন্য লাঙ্গল ও পশু ব্যবহার করতে হত। কৃষকদের লাঙ্গল ও পশু ব্যবহারের জন্য একে অন্যের উপর নির্ভর করতে হত। তাছাড়া ফসল উঠে গেলে কোন জমিই কোন একজন কৃষকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকত না। সকলের গবাদি পশুই সে সব জমিতে চরে বেড়াত।



"ম্যানর" হাউসের নক্শা

এই সব কারণে "ম্যানরীয়" পদ্ধতিতে পরিচালিত ইউরোপের গ্রামগুলিতে কৃষক সমাজ সকলে মিলে চাষ করত।

কঠিন পরিশ্রম এবং করভারে কৃষকদের জীবন ছিল দুর্বিসহ। চাষের কাজের ভূমির মালিক কৃষকদের কোন রকম সাহায্য করত

না। অথচ সমস্ত কৃষককেই ভূমির মালিকের জমিতে কাজ করতে হত। প্রত্যেক সপ্তাহে প্রত্যেক কৃষককে মালিকের জমিতে বেগার তো খাটতেই হত—তার উপর ফসল তোলা অথবা এই রকম বিশেষ বিশেষ সময়ে কৃষকদের মালিকের জন্য আরও বেশী খাটতে হত। অনেক সময়েই এমন অবস্থা হত যে, যখন কৃষক মালিকের জমিতে বেগার খাটছে তখন তার নিজের চাষের ফসলই ঝড় বা বৃষ্টির ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কৃষকরা জমিদার বা মালিকদের জন্য এই যে বাধ্যতামূলক বেগার খাটত, একে বলা হত করভেই ( corvee )। এছাড়া কৃষকদের জমিদারকে কর বা খাজনা দিতে হত। কৃষকরা তাদের উৎপন্ন ফসলের অংশ, মধু, হাঁস-মুরগী, ডিম, মাখন—এমন কি, তাদের তৈরী বস্ত্র, চামড়া ইত্যাদি খাজনা স্বরূপ জমিদারকে দিত। বেগার খাটা এবং খাজনা পেয়েও জমিদারেরা সন্তুষ্ট থাকত না। তারা নিজেদের কলে কৃষকদের গম ভাঙাতে বাধ্য করত, জমিদারের উনানে কৃষকরা রুটি সেঁকতে বাধ্য হত অথবা জমিদারের চাপে কৃষকরা জমিদারের কলে আঙ্গুর পেষাই করে নিজেদের মদ্য প্রস্তুত করত। জমিদারের চাপে এসব কাজ করতে বাধ্য হলেও জমিদাররা কিন্তু কৃষকদের কাছ থেকে কাজের জন্য খাজনা আদায় করত। সেতু, রাস্তা, নদী ব্যবহার করার জন্য ও কৃষকদের খাজনা দিতে হত।

কঠোর পরিশ্রম ও করভার

মালিকের জমিতে বেগার খেটে এবং মালিককে খাজনা দিতে দিতে কৃষকের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠত। কৃষকের স্ত্রী ও মেয়েরা মালিকের বস্ত্র বয়ন করত। কৃষকের ছোট ছোট সন্তানগণ বন থেকে মালিকের জন্য ফলমূল সংগ্রহ করে আনত। রাজা এবং সামন্তগণ ম্যানর থেকে ম্যানরে ঘুরে বেড়াত। তাদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য কৃষকদের শ্রমে উৎপন্ন ফসল সর্বদা 'ম্যানর' বাড়িতে সঞ্চিত থাকত। কৃষকের কন্যার বিবাহের সময় মালিককে নজরানা দিতে হত। কোন কৃষকের মৃত্যু হলে তার পুত্র মৃত কৃষককে প্রদত্ত জমি চাষ করতে চাইলে জমিদারকে নজরানা দিতে হত। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে জমিদার

কৃষকের অবস্থা

কৃষকদের শ্রেষ্ঠ পশুটি লাভ করত। জমিদারের লোকজনেরা সর্বদা কৃষকদের উপর কড়া নজর রাখত—যেন তারা কাজে কোনরকম অবহেলা না করে।

মধ্যযুগে চার্চ ছিল সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর প্রতিনিধি। অনেক সময় জমির মালিক তার জমিতে চার্চ নির্মাণ করত। স্বভাবতই এই সব চার্চে বসবাসকারী পাদরীরা জমির মালিকের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাছাড়া অনেক চার্চ ছিল প্রচুর জমির মালিক। জমিদার এবং চার্চ-এর জমি ব্যবহার করবার জন্য কৃষক জমিদার এবং চার্চকে নানা রকম কর দিত। কখনও নগদ অর্থে, কখনও কোন জিনিস দিয়ে কৃষককে এই কর দিতে হত। কোন কৃষকের মৃত্যু হলে চার্চ মৃত ব্যক্তির সমাধির জন্য তার পরিবারের কাছ থেকে একটি পশু আদায় করত। শ্রেষ্ঠ পশুটি অবশ্য জমিদারই পেত। কিন্তু তার পরেই যে পশুটি ভাল ছিল সেই পশুটি পেত চার্চ। চার্চ কৃষকের উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ আদায় করত। কৃষকের গৃহপালিত নবজাত পশু, যেমন গরু, ঘোড়া, ভেড়া ইত্যাদির এক-দশমাংশ চার্চ লাভ করত। চার্চকে দেয় এই ধরনের কর বা খাজনার নাম ছিল 'চার্চ টাইদ্'।

জমিদার ও চার্চকে কর দেয়

একদিকে কৃষকের জীবনের এই দুঃরবস্থা, অন্যদিকে দুর্গে বসবাসকারী জমির মালিকরা বিলাসের স্রোতে নিমগ্ন থাকত। লোকজন, সেবক, চাকর ইত্যাদি দ্বারা পরিবৃত হয়ে জমির মালিক বিনা শ্রমে দুর্গে আরামের জীবন যাপন করত। দুর্গের অভ্যন্তরে থাকত ফসলের গোলা, হাঁস-মুরগীর ঘর, আস্তাবল, গো-শালা ইত্যাদি। দুর্গের মধ্যে এক প্রান্তে ফলের বাগিচাও থাকত। দুর্গের জীবন ছিল সুখের জীবন।

দুর্গের জীবন

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীবিভাগ খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সমাজ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ হয়ে পড়েছিল। বিশপ ইত্যাদি উচ্চপদস্থ পাদরীগণ প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। জমির মালিকগণ ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় শ্রেণীই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজ

তারা কৃষক এবং শ্রমজীবী। তৃতীয় শ্রেণীর লোকরাই তাদের কঠোর পরিশ্রমে সমাজের সম্পদ সৃষ্টি করত। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিজাতগণ সেই সম্পদ ভোগ করত।

অভিজাতদের জীবনযাত্রা আর কৃষকদের জীবনধারণ যেন দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থিত ছিল। একদিকে প্রাচুর্যের বন্যা, অন্যদিকে কায়ক্লেশে দিন যাপন। অভিজাতগণ দুর্গ বা "ম্যানর" বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে বাস করত। কৃষকগণ বাস করত দুর্গ বা "ম্যানর" বাড়ির প্রাচীরের বাইরে গ্রামে। কৃষক পরিবারগুলি সারি সারি কাচের ঘরে থাকত। তাদের ঘরের চাল খড় দিয়ে ছাওয়া হত। ঘরে কোন চিমনি থাকত না। ফলে ঘরে আগুন জ্বালালে ধোঁয়া ঘরের বাইরে যাবার উপায় ছিল না। তখন ঘরের মধ্যে শ্বাসরোধকারী অবস্থা হত। এদিকে শীতের দেশে ঘর গরম রাখার জন্য আগুন জ্বালালেও নয়। কৃষকদের ঘরের জানালাগুলি ছিল ছোট ছোট। শীতের সময় এই ছোট জানালাগুলি খড় বা কম্বল দিয়ে বন্ধ করতে হত। তখন ঘরের মধ্যেকার অবস্থা হত আরও সাঙ্ঘাতিক। তার উপর শীতের হাত থেকে পশুদের বাঁচাবার জন্য কৃষকেরা গরু, ভেড়া সব নিয়ে একই ঘরে বাস করত। এমনিতেই কৃষকদের ঘর ছিল নোংরা, অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে। ঘরের আসবাব বলতে ছিল হয়ত দু-একটি অতি সাধারণ টেবিল আর কয়েকখানা বেঞ্চ। এই ঘরেই কৃষক পরিবারের সব লোক ঘুমাত। কাঠের বা মাটির মেঝেতে খড় বিছিয়েও কৃষক পরিবারের লোকেরা ঘুমিয়ে থাকত।

দু-ধরনের জীবনযাত্রা

কৃষকদের এই দুঃখ-দৈন্যে ভরা জীবনের পাশাপাশি অভিজাতদের আনন্দ-উল্লাসময় জীবনে সামন্তযুগের শ্রেণীবিভাগ স্পষ্ট করে তোলে। অভিজাতগণ বিশাল প্রাসাদ-দুর্গ বা "ম্যানর" বাড়িতে বাস করত। তাদের বিরাট বিরাট কক্ষ দামী ও সৌখিন আসবাবে সজ্জিত থাকত। প্রতি রাতে সেখানে ভোজসভার বিপুল আয়োজন থাকত। মাঝে মাঝেই অভিজাতরা টুর্নামেন্ট করত, অথবা বেরিয়ে পড়ত শিকারে।

শিকারের পশু কৃষকের ক্ষেতে ঢুকে পড়লে অভিজাত শিকারীরা শিকারের পিছন পিছন চাষীর ক্ষেতে ঢুকে পড়ে তাদের পাকা ফসল নষ্ট করতেও দ্বিধা করত না।

আসলে সামন্তযুগের অধিকাংশ কৃষকই ছিল সার্ফ বা ভূমিদাস। সার্ফরা ছিল জমির মালিকের অস্থাবর সম্পত্তি। সার্ফদের কোনরকম স্বাধীনতা ছিল না। অবস্থার চাপে স্বাধীন কৃষক নিজেই মালিকের কাছে তার স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়ে দলিল সই করত। এ রকম একটি দলিলের নমুনা দেওয়া হলঃ একথা প্রত্যেকেই জানে যে, চরম দারিদ্র্য আর কঠোর পরিশ্রম আমার বিধিলিপি। আমার কোন বাসস্থানও নেই, কোন পরিধেয় বস্ত্রও নেই। আমার প্রার্থনা অনুসারে আপনি (অর্থাৎ মালিক) আমাকে এত অর্থ (অর্থের পরিমাণ) দিয়েছিলেন। কিন্তু সে অর্থ পরিশোধ করার ক্ষমতা আমার নেই। সে কারণে আমি আমার স্বাধীন অস্তিত্ব ত্যাগ করে স্ব-ইচ্ছায় আপনার বন্দিত্ব স্বীকার করছি। এখন থেকে আপনি আপনার ইচ্ছা অনুসারে আমাকে বিক্রি করতে পারেন, বিনিময় করতে পারেন, শাস্তি দিতে পারেন।

সার্ফ—মালিকের অস্থাবর সম্পত্তি ; দলিলের নমুনা

একথা ঠিক যে, প্রাচীন সমাজের ক্রীতদাসদের অপেক্ষা মধ্যযুগের সার্ফদের অবস্থা ছিল অনেক ভাল। ক্রীতদাস এবং সার্ফদের অবস্থা তুলনা করলে দেখা যায়ঃ (ক) ক্রীতদাসদের কোন জমি বা চাষের যন্ত্রপাতি ছিল না ; কিন্তু সার্ফদের নিজেদের খামার ছিল, গবাদি পশু ছিল এবং চাষের যন্ত্রপাতি ছিল। তাদের নিজস্ব মালিকানায় কোন জমি ছিল না বটে, তবে তারা মালিকের জমি ব্যবহার করতে পারত। (খ) ক্রীতদাসকে শুধু তার প্রভুর জন্যই কাজ করতে হত। সার্ফ তার মালিকের জন্য কাজ করলেও, সে তার নিজ পরিবারের জন্যও ফসল ফলাত। (গ) ক্রীতদাসের মালিক ক্রীতদাস কিনতে পারত, বিক্রি করতে পারত, এমন কি হত্যাও করতে পারত। সার্ফ-এর মালিক সার্ফ বেচা-কেনা করতে পারলেও আইনতঃ তাকে হত্যা করতে পারত না।

তথাপি সার্ফরাও ছিল দাস। জমির মালিকের কাছে একজন সার্ফ বংশানুক্রমে চুক্তিবদ্ধ ছিল। মালিক তাকে কিনতে পারত, বেচতে পারত, বিনিময় করতে পারত। এ সম্পর্কে সার্ফরা কিছু-মাত্র আপত্তি জানাতে পারত না। মালিকের জমিতে সার্ফদের বেগার খাটতে হত, কারণে অকারণে নানাবিধ খাজনা দিতে হত। এ বিষয়ে কোন সার্ফ যদি কিছু ত্রুটি করত তবে তার মালিক অপরাধী সার্ফ-এর বিরুদ্ধে নিজেই অভিযোগ আনত, নিজেই বিচার করত, নিজেই তাকে শাস্তি দিত। সার্ফ-এর মৃত্যু হলেও সার্ফ পরিবারের মুক্তি ছিল না। সার্ফ-এর স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে সার্ফ-এর মতই মালিকের আদেশ মেনে চলতে হত।

বাধ্যতামূলক কাজ—বংশানুক্রমিক দাসত্ব

এই অসহনীয় অবস্থা থেকে সার্ফরা মুক্তির উপায় খুঁজত। মালিকের অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য কখনও কোন সার্ফ চার্চ বা খ্রীষ্টান ধর্মীয় সংগঠনে যোগ দিত। খ্রীষ্টান ধর্মীয় সংগঠনও অবশ্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি, তবে চার্চ-এর অভ্যন্তরে শোষণের রূপ এত ভয়ঙ্কর ছিল না। দশম-একাদশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে পশ্চিম ইউরোপে কোথাও কোথাও শহর গড়ে উঠেছিল। শহরে এমন প্রথা প্রচলিত হয়েছিল যে, যদি কেউ শহরে এক বৎসর এক দিন বাস করে তবে সে মালিকের হাত থেকে মুক্তিলাভ করবে। মালিকের কোন অধিকার তার উপর থাকবে না। তখনকার দিনে কথাই ছিল—শহরের বায়ু মুক্ত বায়ু। সার্ফরা তাই ম্যানর থেকে পালিয়ে শহরে আশ্রয় নিত। মুক্তির আশায় কোন কোন সার্ফ আবার ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পকর্মে নিযুক্ত হতে চেষ্টা করত। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মে খাজনা দেওয়া, বেগার খাটা ইত্যাদি শোষণ ছিল না। জীবন সেখানে ছিল অনেক মুক্ত ও স্বাধীন।

মুক্তির উপায়

'শহরের বায়ু মুক্ত বায়ু'

কখনও হত বিদ্রোহ। ম্যানর পল্লীতে পাশাপাশি বাস করার

ফলে সার্ফরা সহজেই নিজেদের সংগঠিত করতে পারত। মালিকের অত্যাচার তাদের এক হতে অনুপ্রাণিত করত। মালিকের অত্যাচার অসহনীয় হয়ে উঠলে সার্ফরা কর্মত্যাগ করত। তারা মালিকের খামার জ্বালিয়ে দিত। সুযোগ পেলে তারা মালিককে হত্যা করত। কখনও কখনও গ্রামের সমস্ত কৃষক গ্রাম থেকে পালিয়ে পাহাড় বা বনাঞ্চলে আশ্রয় নিত। সেখান থেকে তারা কাস্তে, কুঠার, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে মালিকের ম্যানর বাড়ি আক্রমণ করত। মালিকরা কৃষক বিদ্রোহকে ভয় করত।

বিদ্রোহ

এই প্রসঙ্গে ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে স্বতস্ফূর্ত কৃষক বিদ্রোহ এবং ১৫২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির কৃষক বিদ্রোহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

## (ক) অনুশীলনী (১)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিকে (ক) ইংলণ্ডে কি বলা হত? (খ) ফ্রান্সে কি বলা হত? (গ) রাশিয়াতে কি বলা হত? (২) সর্বসাধারণের যোগ্য সম্পত্তি বলতে কি বুঝায়?

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ** শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ রাজা, —, —, — এবং — ছিল সমাজতন্ত্রের উঁচু মহলের কাঠামো। অন্য শ্রেণী ছিল — যারা শোষিত ও নির্যাতিত।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) মধ্যযুগে জমি এবং মানুষে মানুষে সম্পর্ক আলোচনা কর। (২) সামন্ততান্ত্রিক উঁচু মহলের কাঠামো বলতে কি বুঝায়? (৩) সর্বসাধারণের সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যাখ্যা কর।

## অনুশীলনী (২)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) মধ্যযুগের দুর্গ বর্ণনা কর। (২) কাদের নাইট বলা হত? বর্মাবৃত অশ্বারোহী যোদ্ধাদের কথা লেখ। (৩) দুর্গ এবং বর্মাবৃত অশ্বারোহী যোদ্ধাদের ইউরোপের রক্ষাকর্তা বলা হত কেন?

## অনুশীলনী (৩)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) আদেশ মানা সম্পর্কে সামন্ততান্ত্রিক নিয়ম আলোচনা কর। (২) টুর্নামেণ্ট কি?

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** সামন্তদের জীবনধারা আলোচনা কর।

## অনুশীলনী (৪)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) দ্বাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের গ্রামীন অর্থনীতি আলোচনা কর। (২) বীরধর্ম (শিভালরি) সম্বন্ধে টীকা লেখ। (৩) ক্রবাদুরদের কথা আলোচনা কর।

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজে বীরধর্ম এবং ক্রবাদুরের ভূমিকা বর্ণনা কর।

## (খ) অনুশীলনী (৫)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) "ম্যানরীয়" পদ্ধতি কাকে বলে? (২) মধ্যযুগে ইউরোপের গ্রামের মানুষ সাধারণত কিভাবে লোহা এবং লবণ সংগ্রহ করত? (৩) ডুমস ডে বুক বিখ্যাত কেন?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) "ম্যানর"-এর অর্থনৈতিক রূপ আলোচনা কর। (২) 'ম্যানরে' কৃষকদের মধ্যে কিভাবে জমি বন্দোবস্ত হত?

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** "ম্যানরীয়" পদ্ধতি আলোচনা কর।

## অনুশীলনী (৬)

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ** শূন্যস্থান পূরণ কর : — ও — নির্মাণ, — রক্ষা ইত্যাদি প্রশাসনিক কাজের দায়িত্ব—এর মালিককে নিতে হত।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) স্থানীয় শাসনকেন্দ্ররূপে ম্যানর-এর ভূমিকা কি ছিল? (২) কিভাবে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়?

## অনুশীলনী (৭)

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** কেন "ম্যানরীয়" পদ্ধতিতে পরিচালিত ইউরোপের গ্রামগুলিতে কৃষক সমাজ সকলে মিলে চাষ করত?

## অনুশীলনী (৮)

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** ম্যানরে বসবাসকারী কৃষকদের অবস্থা বর্ণনা কর।

## অনুশীলনী (৯)

**টীকা লেখ ঃ** (ক) কৃষকগণ কর্তৃক জমিদার ও চার্চকে দেয় কর; (খ) মধ্যযুগে দুর্গের জীবন; (গ) শ্রেণীবিভক্ত সমাজ; (ঘ) ম্যানরে দু-ধরনের জীবনযাত্রা।

## অনুশীলনী (১০)

**টীকা লেখ ঃ** (ক) সার্ফ; (খ) সার্ফদের বংশানুক্রমিক দাসত্ব; (গ) 'শহরের বায়ু মুক্ত বায়ু'; (ঘ) কৃষক বিদ্রোহ।

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** সার্ফদের অবস্থা বর্ণনা কর। কিভাবে সার্ফরা মুক্তির উপায় খুঁজত?

মুসলমান অধিকার থেকে খ্রীষ্টানদের ধর্মনগর জেরুসালেম ও অন্যান্য পুণ্যস্থান উদ্ধারের জন্য খ্রীষ্টানদের যুদ্ধাভিযান ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ নামে খ্যাত।

একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত মোট আটটি ক্রুসেড অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ ক্রুসেড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এই তিনটি ক্রুসেড-এর মধ্য দিয়ে ধর্মযুদ্ধের পিছনে খ্রীষ্টান সামন্তপ্রভুদের মতিগতি, সমাজ এবং অর্থনীতির উপর এই যুদ্ধাভিযানের প্রভাব ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়।

একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে বেশ কয়েকটি শহর গড়ে উঠেছিল। এই সময়ে ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যও বৃদ্ধি পেয়েছিল। শহর এবং বাণিজ্যের উন্নতির ফলে ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের জীবনযাত্রা আরামদায়ক হয়ে ওঠে। তাদের

**ক্রুসেডের আসল উদ্দেশ্য**

লোভও বৃদ্ধি পেতে থাকে। চার্চ, পোপ এবং উচ্চপদস্থ পাদরীরাও ছিল সামন্তপ্রভু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য সামন্তপ্রভুদের মত উচ্চপদস্থ পাদরীদেরও কোন কাজ করতে হত না। তারা শুধু সার্ফদের কাজের তদারকি করত। চার্চগুলি বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক ছিল। চার্চ-এর শস্যাগার সর্বদা ফসলে পূর্ণ থাকত। খ্রীষ্টীয় মঠগুলির মাঠে বড় বড় গরুর পাল চরে বেড়াত। চার্চ ছিল এইসব গরুর মালিক। মোট কথা, উচ্চ বর্গের পাদরীরা বেশ আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই বাস করত। তারা রেশম এবং ভেলভেটের দামী পোশাক পরত টুর্নামেন্ট পরিচালনা করত, এমন কি যুদ্ধ করতেও পাদরীরা দ্বিধা করত না। আর্ল এবং ডিউকদের মতই পাদরীরা সার্ফদের কাছ থেকে কর আদায় করত, তাদের বেগার খাটাত। বস্তুতপক্ষে মধ্যযুগে চার্চই ছিল ইউরোপের বৃহত্তম

সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন। ধর্ম ব্যতীত এই সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন আরও শক্তিশালী করা এবং সামন্তশ্রেনীর জন্য আরও বেশী সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করাই ছিল ক্রুসেড-এর আসল উদ্দেশ্য।

প্রথম ক্রুসেডেই ধর্মের নামে যুদ্ধের পিছনকার আসল কারণ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের চার্চ এবং অন্যান্য সামন্তরা নিজেদের ভোগের জন্য আরও বেশী জমি এবং সার্ফ-এর প্রয়োজন বোধ করে। কিন্তু সে সময় ইউরোপে আর পাওয়ার মত জমিও ছিল না, সার্ফও ছিল না। অতএব লোভী সামন্তগণ ইউরোপের বাইরে জমি এবং সার্ফ-এর দিকে দৃষ্টি দেয়। ইউরোপীয় বণিকদের নিকট হতে সামন্তগণ জেনেছিল যে, পূর্ব দিকের দেশ অর্থাৎ প্যালেস্টাইন ইত্যাদি অঞ্চল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সেখানকার জাঁকজমকপূর্ণ ও বিলাসবহুল জীবনযাত্রার বিবরণ ইউরোপের সমান্তশ্রেনীকে প্রলোভিত করেছিল।

প্যালেস্টাইন তখন ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কদের অধিকারভুক্ত ছিল। খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রীষ্টের সমাধিভূমি জেরুসালেম প্যালেস্টাইনে অবস্থিত। খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসীদের নিকট পবিত্র স্থানগুলি সে সময় বিধর্মী মুসলিমদের অধিকারভুক্ত ছিল। ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কদের জমি অধিকার করা এবং সেখান থেকে সার্ফ সংগ্রহ করার জন্য ইউরোপীয় চার্চ খ্রীষ্টানদের ধর্মবিশ্বাসের নিকট আবেদন জানাল। প্যালেস্টাইন-এর তুর্করাও ঐক্যবদ্ধ ছিল না। তারা ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ফলে তুর্করাও ছিল দুর্বল। খ্রীষ্ট-জগতের ধর্মগুরু পোপ তুর্কদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইউরোপের সামন্তশ্রেনীর স্বার্থে ধর্মের নামে যুদ্ধের ডাক দেন।

পোপ-এর আহ্বান—ক্রস—ক্রুসেড

পোপ দক্ষিণ ফ্রান্সের একটি বিশাল জনসভায় এই মর্মে ভাষণ দিলেন—বিধর্মীদের হাত থেকে প্রভুর পবিত্র সমাধিভূমি মুক্ত কর। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দাও। যারা ডাকাত ছিলে তারা যোদ্ধা হও। প্যালেস্টাইন দুধ ও মধুর দেশ। যুদ্ধজয়ের ফলে প্রচুর লাভ হবে। পোপ-এর বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু শ্রোতা তাদের জামায়

লাল রঙের ক্রস চিহ্ন সেলাই করে লাগিয়েছিল। খ্রীষ্টানদের নিকট ক্রস চিহ্ন যীশুর আত্মদানের প্রতীক ও পবিত্র চিহ্ন। ক্রস চিহ্ন থেকেই খ্রীষ্টান অভিযানের নাম হল ক্রুসেড।

১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ক্রুসেড অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ক্রুসেডে প্রথম অভিযানকারী ছিল পশ্চিম ইউরোপের দরিদ্র কৃষকদল। দরিদ্র কৃষকদের ক্রুসেডে অংশগ্রহণের কারণ ছিল ভিন্ন। একাদশ শতাব্দীর শেষদিকে পশ্চিম ইউরোপে পর পর কয়েক বৎসর ফসলহানি হয়। ফসলের অভাব এবং প্লেগ ও অন্যান্য মহামারিতে বহু লোক এবং গরু-বাছুর মারা যায়। তার উপর ছিল সামন্তপ্রভুদের অত্যাচার। অত্যাচার, ফসলের অভাব এবং মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য দরিদ্র কৃষকগণ ক্রুসেডে যোগ দিয়েছিল। ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারী কৃষকগণ আশা করেছিল যে, প্যালেস্টাইন-এর জয়-করা জমিতে তারা সুখে এবং স্বাধীনভাবে বাস করতে পারবে। পোপও আশ্বাস দিয়েছিলেন, "যারা দুঃস্থ এবং গরিব তারা সেখানে সুখী এবং ধনী হবে।"

প্রথম ক্রুসেড—কৃষক অভিযান

জেরুসালেম-এর মাটিতে এই গরিব ও প্রায়-নিরস্ত্র কৃষকগণ সেলজুক তুর্কদের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারী অধিকাংশ কৃষক তুর্ক সেনাদের হাতে মৃত্যুবরণ করে।

কৃষক অভিযান ব্যর্থ হবার পর ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইটালী থেকে সামন্তপ্রভুদের নেতৃত্বে ইউরোপের নাইটগণ জেরুসালেম অভিযান করে। সামন্তপ্রভুদের অর্থের অভাব ছিল না। নাইটরা ছিল অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত। সামন্তপ্রভুরা চাকর, ভাঁড় ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে হেলতে-দুলতে যুদ্ধে অগ্রসর হতে থাকে। বিভিন্ন অভিযানকারী দল বাইজানটিয়াম-এর রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে এসে মিলিত হল। সেখান থেকে সামন্তপ্রভুদের মিলিত বাহিনী এসিয়া মাইনর অতিক্রম করে তিন বছর পর জেরুসালেমে উপস্থিত হয়।

প্রথম ক্রুসেড—সামন্তপ্রভুদের অভিযান

১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নাইটরা জেরুসালেম অবরোধ করে। তারা জেরুসালেম জয় করে শিশু-নারী নির্বিশেষে মুসলমান হত্যা করে। জেরুসালেম-জয়ের পর বিজয়ী সামন্তপ্রভুগণ পালেস্টাইন এবং সিরিয়ার সমুদ্র-উপকূলে কয়েকটি রাজ্য স্থাপন করে। এইসব রাজ্যের মধ্যে প্রধান ছিল জেরুসালেম রাজ্য। বিজয়ী ধর্মযোদ্ধাগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য রাজ্য ছিল জেরুসালেম রাজ্যের অধীন সামন্ত। বিজিত অঞ্চলগুলিতে সামন্তপ্রভুগণ সামন্ততান্ত্রিক প্রথা প্রচলন করে। স্থানীয় জনগণকে তারা সার্ফে পরিণত করে। নতুন সামন্তপ্রভুগণ কৃষকদের উৎপন্ন ফসল, আঙ্গুর, জলপাই ইত্যাদির এক-তৃতীয়াংশ, এমন কি অর্ধভাগ পর্যন্ত আদায় করতে থাকে। নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের রাজারা প্রজাদের উপর কর ধার্য করে। তাছাড়া ছিল "টাইদ"—অর্থাৎ চার্চকে দেয় ফসল ও নবজাত পশুর এক-দশমাংশ ভাগ।

জেরুসালেম রাজ্য

১১৪৪ সালে সামন্তপ্রভুদের অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে মুক্তিলাভের জন্য স্থানীয় জনগণ বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহী জনতা খ্রীষ্টান ধর্মযোদ্ধাদের হাত থেকে এডেসা শহর ছিনিয়ে নেয়। এডেসা শহর পুনরুদ্ধারের জন্য দ্বিতীয় ক্রুসেড সংগঠিত হয়। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মযোদ্ধাগণ এডেসা দখল করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

দ্বিতীয় ক্রুসেড

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সালাউদ্দীন বা সালাদিন ছোট ছোট আরব ও তুর্কী রাজ্যগুলি একত্রিত করে একটি শক্তিশালী মুসলিম রাজ্য গড়ে তোলেন। সালাদিন ছিলেন সিরিয়া এবং ঈজিপ্ট এই দুটি ঐতিহ্যময় মুসলিম রাজ্যের সুলতান। ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সালাদিন প্যালেস্টাইন আক্রমণ করেন এবং খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে জেরুসালেম অধিকার করেন।

সালাদিনের এই আশ্চর্যজনক সাহস ও কৃতিত্বে খ্রীষ্টীয় শক্তিগুলি শঙ্কা বোধ করল। পোপ অষ্টম গ্রেগরী এবং তাঁর মৃত্যুর পর পোপ তৃতীয় ক্লিমেণ্ট আহ্বান জানালেন যে, সমস্ত খ্রীষ্টান যেন এই সঙ্কটের মুহূর্তে তাদের ব্যক্তিগত বিভেদ

তৃতীয় ক্রুসেড

ভুলে ধর্মযুদ্ধে যোগ দেয়। এবার ধর্মযুদ্ধের নেতৃত্ব সামন্তপ্রভুদের হাতে না দিয়ে রোমান সম্রাট ফেডারিক বার্বারোসা, ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগস্টাস তৃতীয় ক্রুসেড-এর নেতৃত্ব নিজেরা গ্রহণ করলেন।

১১৮৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তৃতীয় ক্রুসেড অনুষ্ঠিত হয়। সালাদিন অপূর্ব শৌর্য ও রণকৌশল প্রদর্শন করে খ্রীষ্টানদের নিকট হতে জেরুসালেম অধিকার করেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে রিচার্ড সালাদিনের সঙ্গে এই মর্মে সন্ধি স্বাক্ষর করেন যে, জেরুসালেম মুসলিম শক্তির অধিকারভুক্ত থাকবে। মাত্র কয়েকটি বন্দরের উপর খ্রীষ্টানদের অধিকার স্বীকৃত হয়। সালাদিন আশ্বাস দেন যে, এই বন্দরগুলি দিয়ে খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীরা প্যালেস্টাইনে তাদের পবিত্র স্থানগুলিতে আসতে পারবে।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট চতুর্থ ক্রুসেড সংগঠিত করেন। এতদিন পর্যন্ত ক্রুসেডে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধারা স্থলপথে বাইজানটিয়াম এবং এশিয়া মাইনর হয়ে জেরুসালেমে পৌঁছাত। এ পথ ছিল বিপদসঙ্কুল, পাহাড় ও মরুভূমি পার হয়ে এ পথে যাত্রা ছিল ক্লেশকর। চতুর্থ ক্রুসেডের যোদ্ধারা স্থলপথের বিপদসঙ্কুল ও ক্লেশকর যাত্রা পরিত্যাগ করে জলপথে ভূমধ্যসাগর দিয়ে অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত করল। এই উদ্দেশ্যে তারা ভেনিস-এর বণিকদের নিকট হতে জাহাজ ভাড়া করে। ভেনিস-এর বণিকরাও স্বেচ্ছায় ও আগ্রহ সহকারে ধর্মযোদ্ধাদের সাহায্যে এগিয়ে আসল। কারণ ভূমধ্যসাগরের উপর আধিপত্য বজায় রাখা নিয়ে ভেনিস-এর সঙ্গে বাইজানটিয়াম-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ভেনিস-এর বণিকরা বাইজানটিয়াম-এর নৌ-বাণিজ্য ধ্বংস করতে চেয়েছিল। ভেনিস-এর শাসনকর্তা ধর্মযোদ্ধাদের বাইজানটিয়াম আক্রমণ করতে প্ররোচিত করলেন।

চতুর্থ ক্রুসেড

১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মযোদ্ধাগণ বাইজানটিয়াম-এর রাজধানী কনস্টান্টিনোপল-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ক্ষিপ্ত ধর্মযোদ্ধারা

কনস্টান্টিনোপল-এর বিখ্যাত সেণ্ট সোফিয়া গীর্জার অমূল্য চিত্র ও ভাস্কর্য নিদর্শনগুলি বর্বরের মত ধ্বংস করল। অথচ বাইজানটিয়ামও একটি খ্রীষ্টান রাজ্য এবং কনস্টান্টিনোপল ছিল সেদিনের ইউরোপের সমৃদ্ধতম নগর।

কনস্টান্টিনোপল অধিকার করার পর নাইটরা জেরুসালেম যাত্রার কথা ভুলেই গেল। পশ্চিম ইউরোপের সামন্তপ্রভুরা চতুর্থ ক্রুসেডে যোগ দিয়ে পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসর বাইজানটিয়াম অঞ্চলে থেকে গেল।

চতুর্থ ক্রুসেড প্রমাণ করে যে, ধর্ম ছাড়া অন্যের জমি ও পররাজ্য গ্রাস কারাও ছিল ধর্মযোদ্ধাদের উদ্দেশ্য।

ক্রুসেড-এর ফলে ইউরোপ পূর্বদিকের দেশগুলির উন্নততর সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিল। এর প্রভাব ইউরোপের সমাজ ও সংস্কৃতির উপর পতিত হয়। ইউরোপ এশিয়ার খাদ্য ও ফলের আস্বাদ পায়। ইউরোপীয়রা লেবু, এপ্রিকট, তরমুজ ইত্যাদি নতুন নতুন ফলের পরিচয় লাভ করে। ইউরোপে ধানের চাষ আরম্ভ হয়। এশিয়াবাসীদের নিকট হতে ইউরোপীয়গণ রেশম এবং আয়না প্রস্তুতের পদ্ধতি শেখে। ইউরোপ এশিয়ার ধাতুদ্রব্য প্রস্তুতের উন্নত কলাকৌশলেরও সন্ধান লাভ করে। আহারের পূর্বে হস্ত প্রক্ষালন, উষ্ণ স্নান ইত্যাদি স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাত্রাও এই সময়ে ইউরোপীয়গণ এশিয়ার নিকট হতে গ্রহণ করে। ইউরোপের সামন্তপ্রভুরা এশিয়ার অভিজাতদের সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য, সূক্ষ্ম পোশাক, দামী অস্ত্রশস্ত্র ইউরোপে প্রবর্তন করে।

সমাজ ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব

ক্রুসেড-এর ফলে নতুন নতুন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ ইটালী শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। চতুর্থ ক্রুসেড-এর পর উত্তর ইটালীর ভেনিস এবং জেনোয়া শহর ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য পথের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ভেনিস এবং জেনোয়ার বণিকগণ সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনের বন্দরগুলিতে

নতুন নতুন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র

বাড়িঘর, রাস্তা ইত্যাদি ক্রয় করে। এইসব বণিক কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত বন্দরগুলিতেও স্থায়ী বসতির ব্যবস্থা করেছিল।

কৃষি থেকে কুটির শিল্পের পৃথকীকরণ

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে কৃষি ও যন্ত্রপাতির উন্নতির ফলে জীবনযাত্রা উন্নত হয়। তন্তুবায়, মৃৎশিল্পী, কর্মকার, চর্মকার, ছুতার ইত্যাদি কুটির শিল্পের কারিগরদের কাজের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। পূর্বে একজন কৃষক তার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিজেই তৈরী করত। কিন্তু কুটির শিল্পের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এবং এইসব শিল্প প্রস্তুতের জন্য উন্নততর কলাকৌশলের প্রয়োজন হওয়ায় কুটির শিল্প ক্রমে ক্রমে কৃষিকাজ থেকে পৃথক হয়ে গেল। কুটির শিল্পের কারিগররা কৃষির উপর নির্ভর না করে কুটির শিল্পকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করল। ক্রুসেড-এর পর নতুন নতুন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠার ফলে কুটির শিল্পের কারিগরদের সমাদর বৃদ্ধি পেল।

## অনুশীলনী (১)

**মৌখিক প্রশ্ন :** (১) ক্রুসেড কি? (২) কিভাবে ক্রুসেড শব্দটির উৎপত্তি হয়? (২) খ্রীষ্টানদের নিকট ক্রস চিহ্ন পবিত্র কেন?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন :** (১) প্রথম ক্রুসেডে কৃষকদের অভিযান আলোচনা কর। (২) প্রথম ক্রুসেডে সামন্তপ্রভুদের অভিযান আলোচনা কর। (৩) জেরুসালেম রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা লেখ।

**রচনাধর্মী প্রশ্ন :** ক্রুসেড-এর আসল উদ্দেশ্য কি ছিল? প্রথম ক্রুসেড-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

## অনুশীলনী (২)

**রচনাধর্মী প্রশ্ন :** (১) কোন্ সময় তৃতীয় ক্রুসেড অনুষ্ঠিত হয়? এই ক্রুসেড-এর কারণ ও ফলাফল লেখ। (২) কোন্ পোপ চতুর্থ ক্রুসেড সংগঠিত করেন? চতুর্থ ক্রুসেড আলোচনা কর। এই ক্রুসেড থেকে ধর্মযোদ্ধাদের কি উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয়?

## অনুশীলনী (৩)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন :** (১) ইউরোপের সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ক্রুসেড-এর ফল কি ছিল? (২) নতুন নতুন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনে ক্রুসেড-এর অবদান আলোচনা কর। (৩) একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে কৃষি থেকে কুটির শিল্পের পৃথকীকরণ হল কেন?

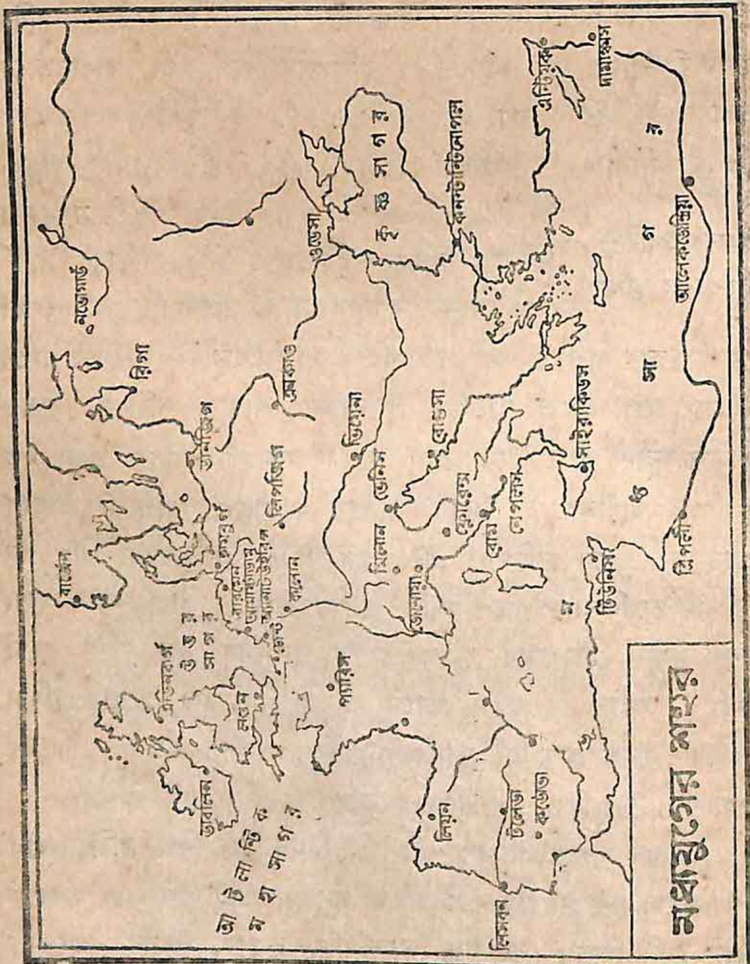
ক্রুসেড-এর ফলে সিরিয়া, ঈজিপ্ট প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইউরোপের অভ্যন্তরে কুটির শিল্পের কারিগরদের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। এইসব কারিগর কৃষির উপর নির্ভর না করে নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বন করে স্বাধীনভাবে চলার চেষ্টা করে। কারিগরদের উৎপন্ন দ্রব্য কেনার ক্ষমতা গ্রামের ভিতর সামান্য লোকেরই ছিল। তার উপর সামন্ত-প্রভুরা কারিগরদের উৎপন্ন দ্রব্য কর ও নজরানা হিসাবে নিজেদের জন্য নিয়ে নিত। কারণ সার্ফ শ্রেণী থেকেই কারিগররা এসেছিল। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কারিগররা সামন্তপ্রভুদের মুক্তিপণ দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে থাকে। অনেকে আবার পলিয়ে গিয়েও সামন্তপ্রভুদের হাত থেকে রক্ষা পায়। ক্রুসেড আরম্ভ হলে বহু কারিগর স্বাধীনভাবে বাঁচার আশায় ধর্মযুদ্ধেও যোগ দিয়েছিল। গ্রাম ছেড়ে এসে কারিগররা খ্রীষ্টান মঠ অথবা দুর্গ অথবা পরিত্যক্ত রোমান দুর্গের আশেপাশে বসতি স্থাপন করে। তারা নদীর ধার, বন্দর অথবা চৌরাস্তার মোড় বসতি স্থাপনের জন্য বেশী পছন্দ করত। কারণ এ রকম স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা বেশী। ক্রমে ক্রমে এই স্থানগুলি শহরে পরিণত হয়। সেদিনের শহরগুলি ছিল শিল্প ও ব্যণিজ্যের কেন্দ্র।

*শহরের উত্থান—ক্রুসেড-এর ভূমিকা*

প্রত্যেক শহরে প্রত্যেক বৃত্তির কারিগর নিজ নিজ বৃত্তির স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সমবায় সঙ্ঘ গঠন করে। এই সমবায় সঙ্ঘকে বলা হত গিল্ড। তন্তুবায়, রাজমিস্ত্রি, ছুতার, চর্মকার প্রত্যেক বৃত্তির আলাদা গিল্ড ছিল। কারিগররা গিল্ড-এর প্রধানকে নির্বাচন করত। গিল্ড একই বৃত্তির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা দূর করে প্রত্যেক সদস্যের স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করত। পণ্যের উৎকর্ষ যাতে বজায়

*গিল্ড—গিল্ড-এর কাজ*

থাকে গিল্ড সেদিকেও দৃষ্টি রাখত। গিল্ড-এর কোন সদস্য ওজন কম দিলে, অথবা ব্যবসায় কোনরকম অসদাচারণ করলে তাকে শাস্তি পেতে হত। গিল্ড-এর প্রধান গিল্ড-এর নিয়মকানুন যাতে পালিত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতেন। শত্রুদল কর্তৃক শহর আক্রান্ত হলে সমস্ত গিল্ড-এর সকল সদস্য একযোগে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করত।




সে যুগের শহরের জনসংখ্যা বেশী ছিল না। একটি শহরে পাঁচ-ছ হাজার লোক বাস করত। তবে লণ্ডন বা প্যারীর মত শহর ছিল ব্যতিক্রম। সেখানে মধ্যযুগেই লক্ষ লক্ষ লোক বাস করত। মধ্যযুগের শহরগুলি ছিল প্রাচীর বেষ্টিত। শত্রুসৈন্যের আক্রমণ

থেকে শহর রক্ষা করার জন্যই শহর ঘিরে প্রাচীর নির্মাণ করা হত।

শহরের জীবন

প্রাচীরের মধ্যে শহরবাসীরা কিছু কিছু চাষবাস করত। শহরের রাস্তাগুলি ছিল সংকীর্ণ। বাস-ভবনেও জায়গার অভাব ছিল। এই অভাব দূর করার জন্য বাস-ভবনগুলি দো-তলা, তিন-তলা করা হত। রাস্তা একে তো সংকীর্ণ, তার উপর বৃষ্টি হলে রাস্তায় জল জমে যেত। শহরে স্বাস্থ্যরক্ষারও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। ফলে মাঝে মাঝেই শহরে সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিত এবং এই ব্যাধিতে বহু লোকের মৃত্যু হত। প্রধান গির্জা ছিল শহরের সবচেয়ে সুন্দর সৌধ। পৌরসভার অধিবেশনের জন্য শহরে টাউন হল নির্মিত হত। সাধারণত টাউন হলের মুখোমুখি থাকত শহরের বাজার। ভিখারী এবং শ্রমিকরা ছিল শহরের গরিব মানুষ। শহরের ধনী মানুষরা আরামেই বাস করত।

মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপের শহরগুলি সামন্ত প্রভুদের শাসনের পরিবর্তে স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিল। কর সংগ্রহ, স্থানীয় বিবাদ

শহরের স্বায়ত্বশাসন
—রাজকীয় সনদ

বিচারের ক্ষমতা ইত্যাদি স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই ক্ষমতা কেবলমাত্র রাজার নিকট হতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং জার্মানির শহরগুলির কর্তাব্যক্তিরা স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য সামন্ত প্রভুদের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের সমর্থক হল। জার্মানির রাজা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হেনরী চার্চ ও অন্যান্য সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে শহরের সমর্থন লাভের আশায় রাজকীয় সনদ দ্বারা শহরের স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করলেন। ইটালীর শহরগুলি অবশ্য রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করে চার্চ-এর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল।

ইউরোপে স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রাপ্ত শহরের অধিবাসীকে "ব্যারজিস" বলা হত। "ব্যারজিস" শব্দ থেকে বুর্জোয়া" শব্দের

বুর্জোয়া

উৎপত্তি হয়েছে। পরবর্তী কালে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় অবশ্য বুর্জোয়া অর্থে পুঁজিবাদী শ্রেণী এবং কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন সম্প্রদায় বুঝায়।

## অনুশীলনী

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** ক্রুসেড-এর পটভূমিকায় শহরে উত্থান, গিল্ড, শহরের জীবন, শহরের স্বায়ত্তশাসন এবং বুর্জোয়া শব্দের উৎপত্তি আলোচনা কর।

চীন এবং জাপান দূর প্রাচ্যের দেশ নামে অভিহিত হয়। মধ্যযুগে এই দুই দেশের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলজনক।

১। চীন ( সপ্তম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী )

সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে চীনে সুই বংশের অবসান হয়। সুই বংশের পর তাঙ বংশ চীনে শাসন ক্ষমতা অধিকার করে। তাঙ বংশ চীনে দশম শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল।

সপ্তম সতাব্দী

তাঙ বংশের সম্রাটগণ বেগার খাটার কঠোরতা হ্রাস করেছিল। এই সময় খাজনা ব্যবস্থারও পরিবর্তন করা হয়। দেশের সমস্ত জমি ব্যবসায়ী, কারিগর এবং ক্রীতদাসদের মধ্যে বিলি-বন্দোবস্ত করা হয়। এইসব ব্যবস্থার ফলে তাঙ শাসনকালে চীনে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি দেখা দিয়েছিল।

অষ্টম শতাব্দী

অষ্টম শতাব্দীতে চীনের উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীগণ সরকারী জমি দখল করতে আরম্ভ করে। এইসব সরকারী কর্মচারীদের অধীনে কৃষকগণ সার্ফে পরিণত হয়। চীনে সামন্ত প্রভুদের বিরাট বিরাট খামার গড়ে ওঠে। সামন্তপ্রভুদের বাড়ি পাহারা দেবার জন্য বেতন দিয়ে সৈন্য রাখার বন্দোবস্ত হয়। কৃষকদের করভারও বৃদ্ধি পায়। এই সময় চীনে কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কর দিতে হত।

নবম শতাব্দী

নবম শতাব্দীতে চীনে প্রচণ্ড কৃষক বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার ও নির্যাতন ক্রমশই সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। তাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কৃষকগণ উত্তর-পশ্চিম চীনের পাহাড় ও বনাঞ্চলে আশ্রয় নিচ্ছিল। সেখানে তারা দলবদ্ধ হয় এবং একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করে। বিদ্রোহী কৃষকদের নেতা ছিলেন হুয়ান চাও। বিদ্রোহীরা হুহান চাওকে সম্রাট ঘোষণা করে। বিদ্রোহী

কৃষক সেনাদল চীনের রাজধানী জয় করে। তারা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও সামন্তপ্রভুদের বন্দী এবং হত্যা করতে থাকে। অতি কষ্টে এই কৃষক বিদ্রোহ দমন করা গিয়েছিল। তবে কৃষক বিদ্রোহের ফলে কৃষকদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন অনেক কমে যায়।

দশম শতাব্দীতে চীন গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়। গৃহযুদ্ধে একদিকে ছিল শক্তিশালী জমিদার শ্রেণী, অন্যদিকে ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা সম্প্রদায়।

দশম শতাব্দী

গৃহযুদ্ধের ফলে তাঙ বংশের অবসান হয়। তাঙ বংশের অবসানের ফলে চীনে বেশ কিছুকালের জন্য কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অভাব দেখা দেয়। একটি ঐক্যবদ্ধ বিশাল সাম্রাজ্যের পরিবর্তে চীনে কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যের আবির্ভাব হয়।

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে চীনের অর্থনীতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময়ে চীনে বড় বড় কর্মশালা গড়ে ওঠে।

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী

হাজার হাজার শ্রমিক কর্মশালাগুলিতে কাজ করত। কর্মশালার প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল রেশম, পোর্সেলিন, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি। কর্মশালাগুলিতে ধাতু গলানোর ব্যবস্থাও ছিল। কর্মশালায় উৎপন্ন দ্রব্যাদি শুধু চীনেই ব্যবহৃত হত না, বিদেশেও রপ্তানী করা হত। চীনের সঙ্গে ভারত, ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। আরব বণিকগণও দক্ষিণ চীনের বন্দরগুলিতে বসতি স্থাপন করেছিল। চীন থেকে মধ্য এশিয়া এবং ইরাণ হয়ে বাইজানটিয়াম পর্যন্ত একটি বাণিজ্যপথও বণিক ও ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করত। এই পথটির নাম ছিল "রেশম পথ"। কারণ চীনের বিখ্যাত রেশম ও রেশমের উৎপন্ন দ্রব্যাদি এই পথ দিয়েই ইউরোপে পৌছাত। রেশমের উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে ছিল রেশম বস্ত্র, নৌকার পাল, ছাতা, বাদ্যযন্ত্রের তার ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীনের উপর মোঙ্গল আক্রমণ আরম্ভ হয়।

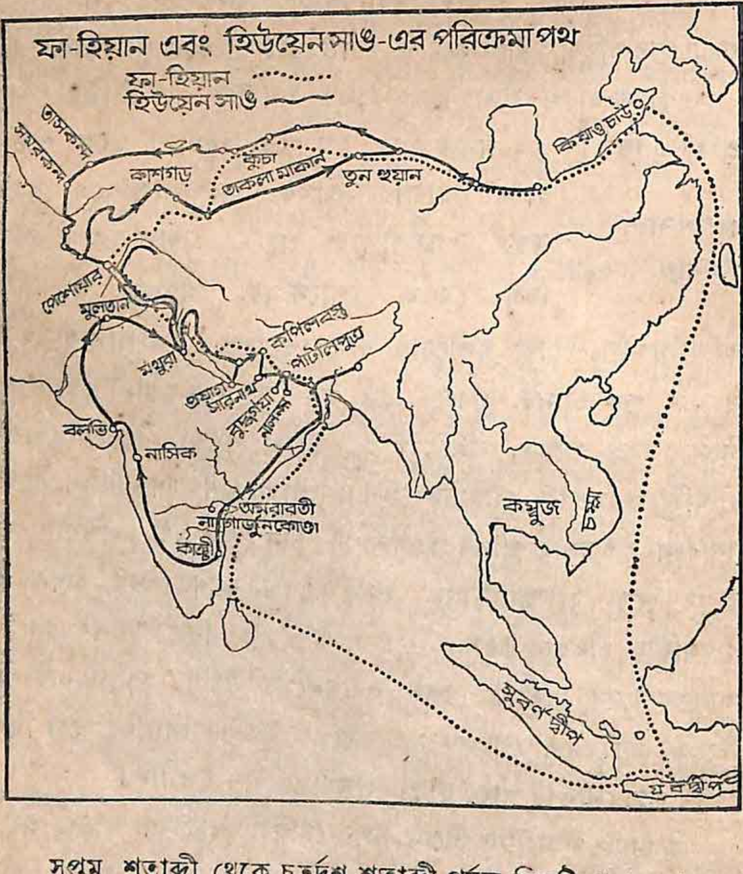
ত্রয়োদশ শতাব্দী

মোঙ্গলরা ছিল দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতি। চীন মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। ক্রমে ক্রমে সমগ্র চীনের উপর মোঙ্গলরা তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা

করে। চীন মোঙ্গল সাম্রাজ্যের একটি অংশে পরিণত হয়।

চতুর্দশ শতাব্দী

চতুর্দশ শতাব্দীতে চীনে মোঙ্গল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। হাজার হাজার কৃষক মোঙ্গল বিরোধী অভ্যুত্থানে যোগ দিয়েছিল। বিদ্রোহীরা লাল ফিতা পরত। তাই এই অভ্যুত্থান "লাল ফিতা অভ্যুত্থান" নামে বিখ্যাত। শহরের লোকেরাও বিদ্রোহে কৃষকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরে সংগ্রামের ফলে চীন মোঙ্গল শাসন দূর করতে সক্ষম হয়।




সপ্তম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত তিনটি প্রধান রাজবংশ চীনে রাজত্ব করেছিল। এই তিনটি রাজবংশের নাম অনুসারে চীনের ইতিহাসের যুগ বিভাগ করা হয়ঃ

(ক) তাঙ যুগ ( ৬১৮—৯০৭ খ্রীঃ )

(খ) সুঙ যুগ ( ৯৬০—১২৮০ খ্রীঃ )

(গ) উয়ান যুগ ( ১২৮০—১৩৬৮ খ্রীঃ )

ঐক্যবদ্ধ চীন—আইন সংস্কার

**(ক) তাঙ যুগ :** ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঙ বংশের সম্রাটগণ চীনে রাজত্ব করে। এই সময়ে চীনে সামন্ততান্ত্রিক শাসন নিপুণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সামন্ততান্ত্রিক শাসনে কৃষকগণ সার্ফে পরিণত হচ্ছিল এবং সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাঙ সম্রাটগণ বিশাল চীন ঐক্যবদ্ধ করে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। সেচব্যবস্থা এবং দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য চীনে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের প্রয়োজন ছিল। বিশেষত উত্তর দিক থেকে যাযাবর জাতিরা প্রায়ই চীন আক্রমণ করত। তাঙ শাসনকালে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির ফলে যাযাবর জাতিদের আক্রমণ বন্ধ হয়। তাঙ সম্রাটগণ উত্তর এবং দক্ষিণ চীনে একই ধরনের সামন্ততান্ত্রিক প্রথা প্রচলনের জন্য আইনের সংস্কার করেন। একই আইন দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে উত্তর এবং দক্ষিণ চীনের মধ্যে ঐক্যবোধ বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষা

এতবড় সাম্রাজ্য সুশাসনের জন্য শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন ছিল। তাঙ যুগে শিক্ষাব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হয়। শহরগুলিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বিদ্যাচর্চার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। উচ্চ শিক্ষারও ব্যবস্থা হয়। অবশ্য ধনী ব্যক্তিদের সন্তানগণই শুধু শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারত। সপ্তম শতাব্দীতে তাঙ সম্রাটদের গ্রন্থাগারে নব্বুই হাজার পুস্তক ছিল। সম্রাটের গ্রন্থাগারে প্রাচীন পুঁথি সযত্নে রক্ষিত হত। চীনের চিকিৎসকগণ বহু ঔষধের ব্যবহার জানতেন। অস্ত্রোপচার দ্বারা চিকিৎসার সময় তাঁরা বেদনানাশক ঔষধ প্রয়োগ করতেন। বসন্ত রোগ প্রতিরোধ করার জন্য দেহে টিকার ব্যবহার চীনের চিকিৎসকদের জানা ছিল। সে যুগে টিকার ব্যবহার মধ্যযুগের চীনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আশ্চর্যজনক অগ্রগতির পরিচয় বহন করে।

তাঙ যুগে চীনে সাহিত্যচর্চা বৃদ্ধি পায়। চীনাদের ইতিহাস-প্রীতি অসাধারণ। চীনে একটি প্রবাদই প্রচলিত রয়েছে—অতীতকে ভুলো না, অতীত ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। চীনা পণ্ডিতগণ প্রাচীনকালের ঐতিহাসিকদের রচনা সংগ্রহ করতেন। তাঁরা চীনা সম্রাটদের রাজকীয় ঘোষণাপত্র আদেশ ও অন্যান্য দলিল থেকে ইতিহাস লিখতেন।

তাঙ যুগে চিকিৎসাবিদ্যা ও সাহিত্যচর্চা ব্যতীত গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, জড়বিজ্ঞান এবং ভূগোল চর্চার জন্য বিখ্যাত। এই যুগে চিত্রাঙ্কন এবং ভাস্কর্য বিদ্যারও প্রভূত চর্চা হত।

সাহিত্য (কবিতা)

তাঙ যুগ বিশেষভাবে কবিতা রচনার জন্য বিখ্যাত। চীনের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে লি পো, তু ফু এবং পো চু-ই এই যুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁদের কবিতা আজও চীনা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে। তাঙ যুগে উপন্যাস রচনারও নতুন ধারা দেখা দেয়।

চা

বাঁধ বেঁধে ও খাল খনন করে চীনে কৃষিকার্যের উন্নতি হয়েছিল। তাঙ শাসনকালে চা-বাগিচা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। চীনের চায়ের খ্যাতি দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে ক্রমে চীনের চা সারা পৃথিবীতে একটি জনপ্রিয় পানীয় রূপে গৃহীত হয়। চা ব্যতীত আখ, কমলালেবু ও অন্যান্য ফসলের চাষ এই সময়ে বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ চীনে বছরে দু-বার করে ধান চাষ হতে থাকে।

ছাপা

অষ্টম শতাব্দীতে চীনে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে সংবাদপত্র ও বই ছাপার কৌশল চীনারাই আবিষ্কার করে। প্রথমদিকে পুস্তক অথবা সংবাদপত্রের বিষয় কাষ্ঠখণ্ডের উপর খোদাই করে কালি দিয়ে এই খোদাই ভরাট করা হত। তারপর খোদাইয়ের উপর কাগজ চাপা দেওয়া হত। একাদশ শতাব্দীতে ছাপার এই প্রথা পরিবর্তিত হয়। তখন থেকে চীনারা কাষ্ঠখণ্ডের উপর বই বা সংবাদপত্র খোদাই না করে এক একটি অক্ষর আলাদা আলাদা ভাবে খোদাই

আরম্ভ করে। এতে ছাপার কাজের খুবই উন্নতি হয়েছিল। তাঙ যুগে সংবাদপত্রে রাজকীয় আদেশ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রকাশিত হত।

তাঙ শাসনকালে চীনে শিল্পকলা খুব উন্নত হয়। স্থপতি, ভাস্কর, চিত্রকরগণ বিদ্যালয়ে শিল্পকলা সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করত। চীনা চিত্রকরগণ লম্বা লম্বা রেশমের বস্ত্রখণ্ড অথবা কাগজের উপর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকত।

শিল্পচর্চা

শিল্পীরা পাথর, ব্রোঞ্জ, হাতির দাঁতের সাহায্যে চমৎকার ফুলদানি, বাক্স, পানপাত্র ইত্যাদি তৈরী করত। এইসব শিল্পকর্মে সূক্ষ্ম নক্সা এঁকে দিত শিল্পীরা। স্থপতিরা নির্মাণ করত বড় বড় প্রাসাদ এবং প্যাগোডা। প্যাগোডা হল মন্দির। কাঠ, পাথর, ব্রোঞ্জ এবং লোহার সাহায্যে প্রাসাদ এবং প্যাগোডা নির্মিত হত। তাঙযুগের প্রাসাদ ও প্যাগোডার ভাস্কর্য আজও দর্শকদের বিস্মিত করে।

এই যুগে চীনে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষি প্রসারলাভ করেছিল। চীনা বণিকগণ চীনের কারিগরদের দ্বারা তৈরি জিনিসপত্র চীনের অভ্যন্তরে এবং চীনদেশের বাইরেও বিক্রী করত। বিদেশে চীনে প্রস্তুত জিনিসের খুব সমাদর ছিল। বিদেশী বণিকরাও ব্যবসার জন্য চীনে যেত। শুধু ভারত, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশ নয়, সুদূর বাইজানটিয়াম-এর সঙ্গেও চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বাণিজ্য সড়ক, নদী ও সমুদ্রের তীরে চীনের শহরতলি গড়ে উঠেছিল। শহরগুলি ছিল প্রাচীর ঘেরা। শহরের নাগরিকদের বাসগৃহ ছাড়াও বহু কর্মশালা এবং গুদামঘর ছিল। কর্মশালাগুলিতে বহু শ্রমিক কাজ করত। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি কৃষিরও খুব উন্নতি হয়েছিল। সেচ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এই সময় চীনে চাল, ইক্ষু, চা, ফল, ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি

তাঙযুগের বহু পূর্বেই চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করেছিল। তাঙ শাসনকালে বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে প্রবলভাবে গৃহীত হয়। মধ্য এশিয়ার যে সব দুর্ধর্ষ জাতি, চীনে বসতি স্থাপন করেছিল যেমন তুর্ক, হুন,

মোঙ্গল ইত্যাদি তারাও এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। বৌদ্ধধর্ম চীনের জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত করতে এবং তাঙ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল। শুধু তাই নয়। চীনের সাংস্কৃতিক বিকাশেও বৌদ্ধধর্মের অবদান ছিল প্রচুর।

চীনে বৌদ্ধধর্ম

তাঙ শাসনকালে চীনা সভ্যতা জাপান, কোরিয়া, আনাম প্রভৃতি দেশে প্রবেশ করে। জাপান চীন থেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। বৌদ্ধধর্ম জাপানীদের আচার-আচরণ ও ধর্ম-বিশ্বাসের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। জাপান চীনের লিপি, পোশাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক প্রথা ইত্যাদি গ্রহণ করতে থাকে। চীনের শাসন-ব্যবস্থার ধারাও জাপান প্রায় সম্পূর্ণভাবে করেছিল। কোরিয়া এবং আনামের উপরও চীনা প্রভাব অনুরূপভাবে পতিত হয়।

চীন সভ্যতা এবং জাপান, কোরিয়া ও আনাম

তাঙ সম্রাট লি শিমিন বিভিন্ন শাসন সংস্কার করে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করতে চেয়েছিলেন। তিনি কর-ব্যবস্থারও সংস্কার সাধন করেন। পুরাতন শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তে তিনি নূতন শাসন-ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এই ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন সরকারী বিভাগ যেন নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে দেশ শাসন করে। মধ্যযুগে চীনের সাংস্কৃতিক এবং শাসনতান্ত্রিক বিকাশ ছিল একটি গ্রহণযোগ্য আদর্শ। কারণ তাঙযুগের সমসাময়িককালে ইউরোপের সামন্ততন্ত্র এত উন্নত ছিল না।

চীন—গ্রহণযোগ্য আদর্শ

তাঙ শাসনকালে চীন দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষু হিউয়েন সাঙ ভারত পরিভ্রমণ করেন। ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশের বর্তমান হোনান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছেন-পাও-কু গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে হিউয়েন সাঙ বৌদ্ধ ভিক্ষুক জীবন গ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই হিউয়েন সাঙ বৌদ্ধ শাস্ত্র এবং সংস্কৃত ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীন সম্রাটের অনুমতি ছাড়াই

হিউয়েন সাঙ ও তাঁর প্রভাব

গোপনে মধ্য এশিয়ার দুর্গম পথ অতিক্রম করে তিন হাজার মাইলেরও বেশি পায়ে হেঁটে ইসিকুল হ্রদ, তাসখন্দ, সমরকন্দ, গন্ধার হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। প্রায় চৌদ্দ বৎসর ভারতে অবস্থান করে তিনি বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন এবং কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান এবং লোপ-নোর হয়ে চীনে প্রত্যাবর্তন করেন। হিউয়েন সাঙ কর্তৃক রচিত ভারত পর্যটন সম্পর্কিত গ্রন্থের নাম তা-তাঙ-সি-য়ু-কি। হিউয়েন সাঙের প্রভাবে সমসাময়িক ভারত সম্রাট হর্ষবর্ধন এবং চীন সম্রাট থাই সুঙের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ভারত ও চীনের মধ্যে দূত বিনিময় হয়।

(খ) সুঙ যুগ (৯৬০—১২৮০ খ্রীঃ): দশম শতাব্দীর প্রথম দিকেই তাঙ সম্রাটগণ দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তুর্ক এবং মোঙ্গলগণ চীন আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে বিশাল তাঙ সাম্রাজ্য ভেঙে যেতে থাকে। চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে। সুঙ দক্ষিণ চীনের এমনি একটি রাজ্য। কয়েকজন সুদক্ষ সম্রাটের অধীনে এই ক্ষুদ্র রাজ্য বিশাল সুঙ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। সুঙ সম্রাট তাই সুঙ (৯৭৫—১০০০ খ্রীঃ) এবং শেন সুঙ (১০০৭—১০৫২ খ্রীঃ) চীনের অন্যান্য অঞ্চল জয় করে ঐক্যবদ্ধ সুঙ সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুঙ সম্রাট ওয়াং গাওচি সমাজ সংস্কার আরম্ভ করেন। প্রায় এই সময়ে "বিজয়ী উইলিয়ম" ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন। ওয়াং গাওচির মত সংস্কারকার্য এবং বিভিন্ন পরীক্ষামূলক কার্য ইউরোপে আরও কয়েক শতাব্দী পর আরম্ভ হয়। ওয়াং গাওচি জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দেন এবং এভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কৃষকদের মজুরীর হার নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। ছোট ছোট চাষীদের জন্য সম্রাট ওয়াং গাওচি সরকারী কোষাগার থেকে ঋণ সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন।

পরীক্ষামূলক কার্য—ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব—কৃষকদের সরকারী সাহায্য—সম্পত্তি কর

তাঁর শাসনকালে সামন্ত প্রভুদের সম্পত্তির উপর কর ধার্য হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এই কর লাভ করত।

সুঙযুগে চীনে বড় বড় কর্মশালা স্থাপিত হয়। হাজার হাজার কারিগর এইসব কর্মশালায় কাজ করত। কর্মশালাগুলিতে রেশম, পোর্সেলিন, অস্ত্রশস্ত্র ও বিভিন্ন ধাতুর তৈরি শিল্পকর্ম প্রস্তুত হত।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

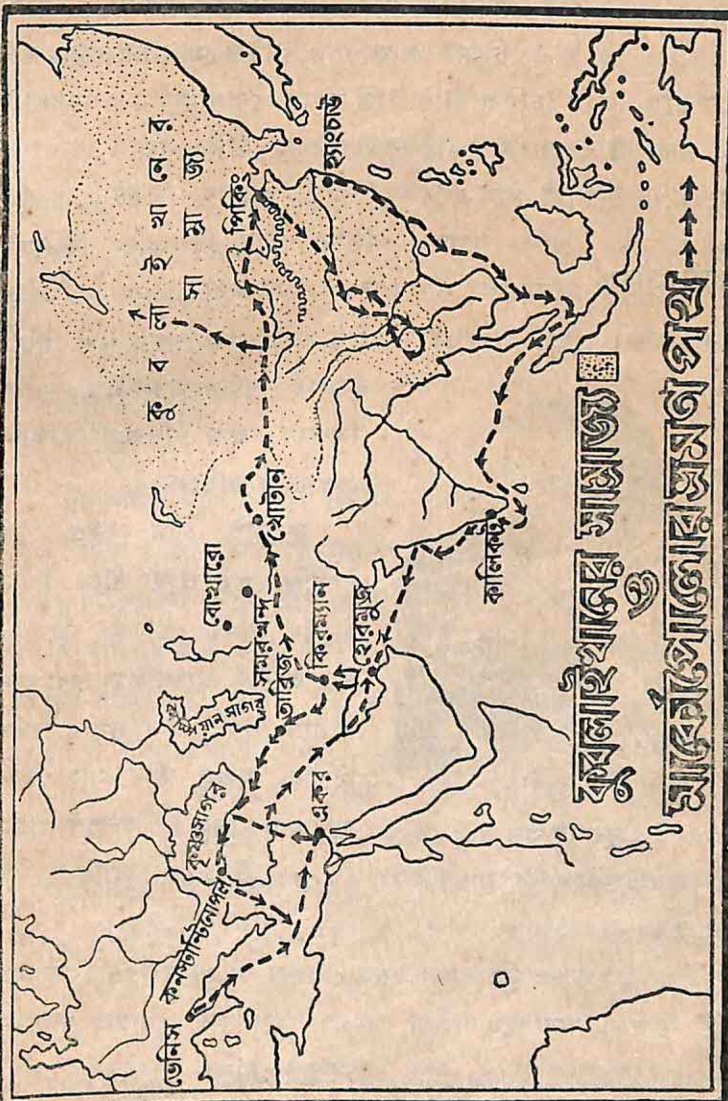
এই যুগে চীনা নাবিকেরা সমুদ্রযাত্রার জন্য কম্পাস-এর ব্যবহার আরম্ভ করে। মুদ্রণের জন্য চীনা বর্ণমালারও উন্নতি সাধন করা হয়। সুঙযুগে চীনে ব্যাপকভাবে বারুদের ব্যবহার প্রচলিত হয়। চীনা কারিগরগণ বারুদ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষালাভ করে বারুদের সাহায্যে বাজি বানাত। সুঙ সম্রাট হোয়াই সুঙ শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজে কবিতা রচনা করতেন এবং রেশমের কাপড়ের উপর ছবি আঁকতেন। সুঙ সম্রাটগণ বিভিন্ন কারখানার শিল্পকর্ম পরিদর্শন করতেন। রাজধানীতে উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মের প্রদর্শনী হত। সুঙ শাসনকাল শিক্ষাচর্চা এবং পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতিলাভ করে। এই সময়ে চীনে চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও বিশেষ উন্নতি হয়।

(গ) **উয়ান যুগ** ( ১২৮০—১৩৬৮ খ্রীঃ ) : ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনাতেই মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান চীন আক্রমণ করেন। চেঙ্গিস খানের পারিবারিক নাম ছিল তেমুজিন। যুবক বয়সেই তেমুজিন বিশ্ব-বিজয়ী হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং চেঙ্গিস খান উপাধি গ্রহণ

মোঙ্গল

করেছিলেন। চেঙ্গিস খান অর্থ পরাক্রান্ত বিশ্ব-বিজয়ী। মোঙ্গলরা মঙ্গোলিয়ার অধিবাসী। মোঙ্গল সমাজে দলপতি অথবা রাজাকে খান বলা হয়। চেঙ্গিস খানের সময় মোঙ্গল সমাজ বহু জাতি উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। চেঙ্গিস বিভিন্ন মোঙ্গল জাতি ও উপজাতিদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি দুর্ধর্ষ সৈন্যদল গঠন করেন। মোঙ্গল বাহিনীর বৈশিষ্ট্য ছিল বিদ্যুৎ-গতিসম্পন্ন অশ্বারোহী দল। মোঙ্গল অশ্বারোহী বাহিনীর বিদ্যুৎগতি ও চমকপ্রদ রণকৌশল ইউরোপীয় এবং মুসলিম শক্তিগুলিকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল।

১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিস খান সর্বপ্রথম চীন আক্রমণ করেন। পরবর্তী দশ এগার বৎসরের মধ্যে সমগ্র উত্তর চীন চেঙ্গিস-এর




অধিকারভুক্ত হয়। ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিসের সাম্রাজ্য পিকিং ( বর্তমান নাম বেজিং ) থেকে পারস্য এবং সিন্ধুনদ থেকে সাইবেরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

কুবলাই খান ছিলেন চেঙ্গিস খানের পৌত্র। কুবলাই পিকিং-এ রাজপদে অধিষ্ঠিত হন এবং চীনে মোঙ্গল উয়ান বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। মোঙ্গল হলেও কুবলাই খান চীনের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মেনে নিয়েছিলেন। রাজসভায় তিনি চৈনিক রীতিনীতি বজায় রেখেছিলেন। কুবলাই খান এবং তাঁর অধীনস্থ রাজকর্মচারিগণ চৈনিক লিপি ব্যবহার করতেন। কুবলাই খান জনৈক তিব্বতী লামার নিকট বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর দীক্ষাগুরু তিব্বতী লামাকে তিব্বতের সর্বেসর্বা পদে নিযুক্ত করেছিলেন। তখন থেকেই তিব্বতে দলাইলামা পদের সৃষ্টি হয়।

কুবলাই খান—উয়ান বংশ

তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম



কুবলাই খান

কুবলাই খান মঙ্গোলীয় ভাষা শিক্ষার জন্য তিব্বতী লিপি প্রবর্তন করেছিলেন।

কুবলাই খান সমগ্র সুঙ সাম্রাজ্য জয় করে চীনে উয়ান বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। চীন ব্যতীত মঙ্গোলিয়া এবং রুশ সীমান্ত থেকে চীন সাগর পর্যন্ত বিশাল অঞ্চল তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুবলাই খান ছিলেন প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী শাসক। ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই খানের মৃত্যু হয়।

কুবলাই খানের মৃত্যুর পর চীনে মোঙ্গল শ.সন আরও কিছুকাল স্থায়ী ছিল। অবশেষে চীনের জনগণ বৈদেশিক মোঙ্গল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে চীনের বিদ্রোহ জয়ী হয় এবং মঙ্গোলরা চীন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

**মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনীঃ** মার্কো পোলো ছিলেন মধ্যযুগের একজন বিশিষ্ট পর্যটক। তিনি ভেনিস-এর অধিবাসী

ছিলেন। কুবলাই খানের শাসনকালে মার্কো পোলো চীন পরিভ্রমণ করেন। মার্কো পোলো তাঁর পর্যটক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনী থেকে কুবলাই খানের শাসনাধীন চীনের বহু তথ্য জানা যায়।

১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে মার্কো পোলো ভেনিসে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে তিনি ভেনিস থেকে একটি ছোট জাহাজে চড়ে পর্যটনে বার হন। সাড়ে তিন বৎসর সাগর, নদী, মরুভূমি পার হয়ে অশেষ দুর্যোগ ও দুর্বিপাক সহ্য করে তিনি চীনে উপস্থিত হন। চীনে কাশগড় থেকে তিনি কান-চাউ পৌঁছান। সম্ভবত কান-চাউতেই মার্কো পোলো সর্বপ্রথম চীনের বিখ্যাত প্রাচীর দেখেছিলেন।

কান-চাউ থেকে পোলো চীনের রাজধানী পিকিং-এর ( বর্তমান নাম বেজিং ) দিকে অগ্রসর হন। যখন মার্কো পোলো পিকিং থেকে চল্লিশ দিন দূরের পথে রয়েছেন, তখনই চীন সম্রাট কুবলাই খানের দূতদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। চীনের ডাক-ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সংগঠিত। সংবাদ পরিবহণের জন্য প্রতি কুড়ি মাইল অন্তর ঘোড়া ও অশ্বারোহী রাখা হত। ঘোড়ার জিনে ঘণ্টা বাঁধা থাকত। অশ্বারোহী দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে সংবাদ নিয়ে আসত। যখনই ঘণ্টার শব্দ শোনা যেত, তখনই পরবর্তী অশ্বারোহী প্রস্তুত থাকত। দিনরাত এইভাবে ঘোড়ার পিঠে সংবাদ পাঠান হত। সুসংগঠিত ডাকব্যবস্থার জন্য শত শত, এমন কি হাজার হাজার মাইল দূরেও সংবাদ দ্রুতগতিতে পাঠান যেত।

চীনের ডাক-ব্যবস্থা

পিকিং-এর রাজপ্রাসাদ ছিল মর্মরপ্রস্তর-নির্মিত। প্রাসাদের কক্ষগুলিতে ছিল সোনার কারুকার্য। এই প্রাসাদেই কুবলাই খানের সঙ্গে মার্কো পোলোর সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতের সময় সম্রাট এবং তাঁর সভাসদ্‌গণ মূল্যবান রেশমবস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন।

রাজপ্রাসাদ— রাজ-সজ্জা

চীনের রাজধানী পিকিং ছিল চতুর্ভুজাকার ও প্রাচীর পরিবেষ্টিত। রাজধানীর চারপাশে বারটি দরজা ছিল। প্রত্যেক দরজায় এক হাজার প্রহরী পাহারা দিত। রাজধানীর মধ্যস্থলে ছিল একটি বিরাট ঘন্টা। রাত্রে এই ঘন্টা বাজান হত। নিশুতি রাতে কাউকে রাজধানীর বাইরে যেতে দেওয়া হত না।

রাজধানী পিকিং

মার্কো পোলোর বিবরণ থেকে আরও জানা যায় যে, পশ্চিম ইউরোপের বহু পূর্বেই চীনে কাগজের নোট প্রচলিত ছিল।

নিজের অধ্যবসায় গুণে মার্কো পোলো চীনের চারটি প্রধান ভাষা শিখেছিলেন। কুবলাই খান মার্কো পোলোকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজে নিয়োগ করেন। এমন কি, তিনি উয়ান-গুই প্রদেশের রাজ্যপাল পর্যন্ত নিযুক্ত হয়েছিলেন।

চীনভ্রমণে মার্কো পোলোর সঙ্গী ছিলেন তাঁর পিতা নিকোলো এবং খুল্লতাত মাফেয়ো পোলো। দীর্ঘকাল চীনে অবস্থানের পর মার্কো পোলো তাঁর পিতা এবং খুল্লতাতকে নিয়ে ভেনিসে প্রত্যাবর্তন করেন ( ১২৯৫ খ্রীঃ )।

## অনুশীলনী (১)

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চীনের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা কর।

## অনুশীলনী (২)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীনে মোঙ্গল অভিযান। (২) লাল ফিতা অভ্যুত্থান। (৩) তাঙযুগে চা-বাগিচা।

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** তাঙযুগের শিক্ষা ও সাহিত্য আলোচনা কর।

## অনুশীলনী (৩)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) তাঙযুগের শিল্পচর্চা আলোচনা কর। (২) তাঙ শাসনকালে কিভাবে চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি হয়? (৩) তাঙযুগে চীনের বৌদ্ধধর্মের কথা বল।

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** তাঙযুগে চীনের বৌদ্ধধর্ম, শিল্পচর্চা ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির বর্ণনা দাও।

## অনুশীলনী (৪)

**মৌখিক প্রশ্ন :** (১) হিউয়েন সাঙ কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন? (২) হিউয়েন সাঙ কর্তৃক রচিত ভারত সম্পর্কিত পুস্তকের নাম কি?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন :** (১) জাপান, কোরিয়া এবং আনাম-এর উপর চীন-সভ্যতার প্রভাব আলোচনা কর। (২) মধ্যযুগে চীনের কোন্ আদর্শ গ্রহণযোগ্য আদর্শ বলে বিবেচিত হয়? (৩) হিউয়েন সাঙ কে ছিলেন? ভারত-চীন সম্পর্ক স্থাপনে তাঁর প্রভাব কিভাবে কাজ করেছিল?

## অনুশীলনী (৫)

**মৌখিক প্রশ্ন :** (১) সুঙ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পিছনে দু'জন সম্রাটের নাম উল্লেখ কর। (২) সমাজসংস্কারের জন্য বিখ্যাত একজন সুঙ সম্রাটের নাম বল। (৩) সম্রাট হোয়াই সুঙ বিখ্যাত কেন?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন :** আলোচনা কর—(ক) সুঙযুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং কৃষকদের সরকারী সাহায্য; (খ) সুঙযুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতি।

## অনুশীলনী (৬)

**মৌখিক প্রশ্ন :** (১) 'খান' অর্থ কি? (২) চেঙ্গিস খানের পারিবারিক নাম কি? (৩) 'চেঙ্গিস খানের' অর্থ কি?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন :** (১) চেঙ্গিস খানের সময়কার মোঙ্গল সমাজের কথা বল। (২) কে উয়ান বংশ প্রতিষ্ঠা করেন? কুবলাই খানের পরিচয় লেখ।

## অনুশীলনী (৭)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন :** আলোচনা কর—ক) কুবলাই খান এবং তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম; (খ) কুবলাই খানের সাম্রাজ্য; (গ) চীনে উয়ান শাসনের অবসান।

## অনুশীলনী (৮)

**মানচিত্র-বিষয়ক প্রশ্ন :** মানচিত্রে প্রদর্শন কর—ভেনিস; সমরখন্দ; খোটান; পিকিং।

**মৌখিক প্রশ্ন :** (১) মার্কো পোলো কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন? (২) কত বৎসর বয়সে মার্কো পোলো পর্যটনে বার হন?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন :** আলোচনা কর—(ক) চীনের ডাক-ব্যবস্থা; (খ) মার্কো পোলোর সময়কার পিকিং।

**রচনাধর্মী প্রশ্ন :** মার্কো পোলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুসারে চীনের কথা কি জানা যায়।

## মধ্যযুগে জাপান

এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে যখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনীতির আবির্ভাব হচ্ছিল জাপানেও তখন সামন্ততান্ত্রিক প্রথার সূচনা হয়। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানী সমাজে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সব লক্ষণই দেখা দিয়েছিল। সমাজের উপরদিকে ছিল বিভিন্ন সামন্ততান্ত্রিক পরিবার, নিচের দিকে ছিল স্বাধীন কৃষক, বংশানুক্রমে সামন্তপ্রভুদের উপর নির্ভরশীল কৃষক এবং কিছু দাস শ্রমিক। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে জাপানে একটি সামন্ত পরিবার বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। এই পরিবারটি হল সুমেরাগি বংশ। সুমেরাগি বংশ জাপানের রাজ-ক্ষমতা আয়ত্ত করেছিল।

মধ্যযুগের সূচনা-কালে জাপানী সমাজ ও সামন্ত-তান্ত্রিক অর্থনীতি

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে জাপানে কিছু কিছু শহর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়ে শিল্পেরও প্রসার হয়। শহরের শাসন সুপরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ শাসকের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য জাপানে একটি শাসক-শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। আরও একটি বিশেষ শ্রেণীর উত্থান জাপানে হল। এই শ্রেণীটি হল শিণ্টো পুরোহিত সম্প্রদায়। শিণ্টোধর্ম জাপানের প্রাচীন ধর্ম। সুমেরাগি রাজ-পরিবার শিণ্টোধর্মের অনুগামী ছিল।

৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে সোগা পরিবার কিছুকালের জন্য সুমেরাগিদের নিকট হতে ক্ষমতা দখল করেছিল। ক্ষমতা দখলের সময় সোগারা জাপানী কৃষকদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছিল। কিন্তু ক্ষমতা দখলের পর সোগারা কৃষকদের সম্পূর্ণ অবহেলা করল। কৃষকদের অবস্থা যা ছিল তাই-ই থেকে গেল। সোগা শাসনকালে জাপানী সামন্তপ্রভুরা বৌদ্ধধর্ম প্রচারে খুব উৎসাহ দেয়। কারণ

তারা ভেবেছিল যে, শিণ্টোধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম শ্রেণীশাসন বজায় রাখতে বেশী সাহায্য করবে।

পঞ্চাশ বছরের মত সোগা শাসনের পর সুমেরাগি বংশ পুনরায় জাপানের রাজ-ক্ষমতা দখল করে। সুমেরাগি বংশের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পর এই বংশের শাগকেরা কেন্দ্রীয় শাসন শক্তিশালী করে তোলে। জাপানের সম্রাটকে মিকাডো বলা হয়। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাজশক্তির প্রশ্রয় ভাল করে সামন্তপ্রভুগণ স্বাধীন কৃষকদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে। সামন্তপ্রভু'দর আন্দোলনের ফলে জাপানী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়। ৭০২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে শাসনসংস্কার করা হল। এই শাসনসংস্কারে বলা হয়ঃ (১) মিকাডো জাপানের সমস্ত জমির মালিক; (২) স্বাধীন কৃষকেরা এই শর্তে সাময়িকভাবে জমি চাষের অধিকার পাবে যে, তারা জমি চাষের জন্য কর দেবে এবং অন্যান্য নিয়ম-কানুন মেনে চলবে; (৩) কৃষকেরা জমি ছেড়ে যেতে পারবে না।

মিকাডোর সর্বময় ক্ষমতা

৭০১ খ্রীষ্টাব্দের শাসন সংস্কারের ফলে জাপানের স্বাধীন কৃষকসমাজ সরকারের অধীনে সার্ফে পরিণত হল। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ এবং অভিজাত পরিবারগুলি শাসনসংস্কারের সুযোগ গ্রহণ করে এবং প্রচুর জমির দখল নিল। পরে তারা এইসব জমি পুরুষানুক্রমে ভোগ করার ব্যবস্থা করেছিল। রাজকর্মচারী এবং অভিজাতগণ কৃষকদের নিকট হতে যে খাজনা আদায় করা হত তারও কিছু ভাগ নিজেদের জন্য রেখে দেওয়ার অধিকার পেয়েছিল। অষ্টম শতাব্দীতে জাপান চীনের পথ অনুসরণ করেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনে। চীন ছিল উন্নততর সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র। চীনে তাঙ শাসনকাল থেকেই জাপান চীনের শাসন-ব্যবস্থা ও সামাজিক রীতিনীতি অনুকরণ করে আসছিল। বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে চীনের সঙ্গে জাপানের যোগা'যাগও নিবিড় হয়ে ওঠে।

চীনের পথে

৭১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের ইতিহাস নারা-

যুগ নামে বিখ্যাত। সে সময় জাপানের রাজধানী ছিল নারা। রাজধানীর নাম অনুসারেই যুগটির নাম চিহ্নিত হয়েছে।

নারা যুগ জাপানের সমৃদ্ধির যুগ। এই সময়ে জাপানের শিল্প-সাহিত্যও বিকাশ লাভ করে। সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি এবং চাষের জমি বৃদ্ধির ফলে চাল উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। শহরগুলির উন্নতি হতে থাকে। খনির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অষ্টম শতাব্দীর সামন্ততান্ত্রিক শাসনসংস্কার জাপানের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় করেছিল।

নারা যুগের পর জাপানে হেইয়ান যুগ আরম্ভ হয়। নবম, দশম এবং একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত জাপানের ইতিহাস হেইয়ান যুগের ইতিহাস নামে পরিচিত। অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে মিকাডোর অধীন দরবারের সামন্ত শাসকগণ এবং প্রদেশগুলিতে রাজকর্মে নিযুক্ত সামন্ত শাসকগণ জাপানের প্রাচীন অভিজাত পরিবারগুলির ক্ষমতা খর্ব করে মিকাডোর উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। মিকাডোর সর্বময় ক্ষমতা প্রতিরোধ করে তারা যেসব জমি ভোগ করছিল সেই সব জমির উপর বংশানুক্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল বৃহৎ পরিবারগুলির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একদিকে মিকাডোর দরবারের সামন্ত শাসকগণ এবং মিকাডো কর্তৃক নিযুক্ত প্রাদেশিক সামন্ত শাসকগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, অন্যদিকে এই বৃহৎ সামন্ত পরিবারগুলি সকলেই মিকাডোর ক্ষমতা হ্রাস করতে চেয়েছিল। বৃহৎ পরিবারগুলির প্রতিরোধের ফলে মিকাডোর প্রকৃত ক্ষমতা ফুজিওয়ারা পরিবারের হস্তগত হল। ফুজিওয়ারা পরিবার ছিল জাপানের প্রচুর জমির মালিক। হেইওয়ান যুগের আরম্ভকালে এই ছিল জাপানের অবস্থা।

বৃহৎ পরিবারগুলি কর্তৃক প্রতিরোধ

হেইওয়ান যুগে জাপানের ভূমি-ব্যবস্থা প্রধানত ছিল শোয়েন ব্যবস্থা। শোয়েন ব্যবস্থা অনুসারে জমি করমুক্ত ছিল। যেসব জমি অনাবাদী ছিল, মিকাডো সেই সব জমি কোনরকম কর না

নিয়েই বিলি করত। পরে জমিতে চাষ হলেও জমির মালিককে কর দিতে হত না। কৃষকগণ সরকারী জমির চাষ ছেড়ে দিয়ে দলে দলে শোয়েন এলাকায় চাষের কাজের জন্য আসতে থাকল। শোয়েন ভূমি-ব্যবস্থায় রাজকোষের রাজস্ব কমে গেল। তাছাড়া শোয়েন এলাকার মালিকরা নূতন একটি জমিদারশ্রেণী রূপে দেখা দিল। এই নূতন জমিদারশ্রেণীও মিকাডোর কর্তৃত্ব প্রতিরোধ করেছিল।

শোয়েন

বৃহৎ পরিবারগুলির প্রতিরোধ ভেঙে দিয়ে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য মিকাডো কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মিকাডো-বিরোধী বৃহৎ পরিবারগুলির অধিকাংশই ছিল বৌদ্ধধর্মের সমর্থক। শিন্টোধর্ম জাপানীদের প্রাচীন ধর্ম। মিকাডো শিন্টোধর্ম সমর্থন করল। শুধু তাই নয়, মিকাডো শিন্টোধর্মের প্রধান পুরোহিত এবং শাসনক্ষমতার সর্বময় অধীশ্বর রূপে নিজেকে ঘোষণা করল। প্রজাদের নিকট মিকাডো হল "তেন সি" অর্থাৎ স্বর্গপুত্র অথবা "তেন্নো"—অর্থাৎ স্বর্গীয় রাজা। জাপানী প্রজাদের কাছে এমন প্রচার করা হল যে, মিকাডো যেন ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই রাজক্ষমতা লাভ করছে। রাজকোষের অর্থাভাব দূর করার জন্য মিকাডো কৃষকদের খাজনা বাড়িয়ে দিল। কৃষকেরা বাড়তি খাজনা এড়াবার জন্য শোয়েন এলাকায় চলে গেল। কৃষকের অভাবে কৃষি-জমিতে কাজ কমে গেল। ফলে রাজকোষে আরও অর্থের অভাব দেখা দিল। এছাড়া ছিল কৃষক বিদ্রোহ। নবম, দশম এবং একাদশ শতাব্দীতে জাপানে মাঝে মাঝেই কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে।

মিকাডো—শিন্টো প্রধান পুরোহিত ও সর্বময় অধীশ্বর

মিকাডোর চেষ্টা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় রাজশক্তি ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ছিল। বৃহৎ পরিবারগুলি ক্রমশই বেশি বেশি জমি ও সরকারী শাসন-ব্যবস্থার উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করছিল। তাদের অধিকারও পুরুষানুক্রমিক হয়ে উঠেছিল। এদিকে বৌদ্ধ মঠগুলিও প্রচুর জমির মালিক হয়ে ওঠে। বৌদ্ধমঠের জমির

বৃহৎ পরিবার ও বৌদ্ধ মঠের শক্তি বৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় শক্তি হ্রাস

মালিকানা ব্যবস্থাও সামন্ততান্ত্রিক ধারা অনুসারে সংগঠিত হয়েছিল। এইসব কারণে মিকাডোর ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছিল।

সরকারী জমিতে নিযুক্ত কৃষকদের শোয়েন জমিতে চলে যাওয়া রোধ করার জন্য মিকাটো অধিকাংশ সরকারী জমি ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে সামুরাইদের হস্তে ন্যস্ত করে। ইউরোপের নাইটদের মত জাপানের সামুরাই ছিল বিশ্বস্ত সৈনিক। অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই সামুরাইদের সৈনিক বৃত্তি সমাজে মর্যাদার আসন লাভ করে। তখন সরকারী নিয়ম ছিল যে, সবল ব্যক্তি সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করবে এবং দুর্বল ব্যক্তি শ্রমিক হবে।

সামুরাই

সেদিনের শ্রেণীবিভক্ত সামন্ততান্ত্রিক জাপানী সমাজে শ্রমিকের মর্যাদা ছিল না। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সামুরাইদের প্রভাব ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে জাপানের উত্তর ও পূর্ব ভাগ সামুরাইদের প্রভাবাধীন হয়। ১০৬৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মিকাডো সামুরাই ও শিণ্টো ধর্মাবলম্বীদের সাহায্যে এবং বৃহৎ পরিবারগুলির পারস্পরিক বিষাদের সুযোগ নিয়ে স্বাধীন নীতি অনুসরণ করতে সমর্থ হয়।

জাপানের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার গোষ্ঠী পরিবারগুলির প্রধান অংশগ্রহণ করেছিল। একটি গোষ্ঠী পরিবারের স্বার্থের সঙ্গে অন্য গোষ্ঠী পরিবারের স্বার্থের মিল ছিল না। এবং প্রত্যেক পরিবার নিজ নিজ স্বার্থ অনুসরণ করে চলছিল। ফলে মিকাডোর শাসন বা কেন্দ্রীয় রাজশক্তি প্রায়ই দুর্বল হয়ে পড়ত। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাপানের অধিকাংশ জমি এবং শাসনক্ষমতা তিনটি প্রধান পরিবারের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েঃ (ক) উত্তর জাপানের মিনামোতো পরিবার। সামুরাইগণ এই পরিবারের অনুগত ছিল। (খ) দক্ষিণ জাপানের তায়রা পরিবার। তায়রা পরিবার দক্ষিণ জাপানের প্রচুর জমির মালিক ছিল। (গ) রাজধানীর ফুজিওয়ারা পরিবার। ফুজিওয়ারা পরিবার ছিল মিকাডোর অনুগত। জমির

মালিকানা ছাড়াও এই পরিবারের লোকজন উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হত।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জাপানে সামন্তগোষ্ঠীভুক্ত পরিবার-গুলির মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। এই সংঘর্ষে তায়রা পরিবার এবং ফুজিওয়ারা পরিবার পরাজিত হয়। বিজয়ী হয় উত্তর জাপানের মিনামোতো পরিবার। বিজয়ী মিনামোতো যোরিতোমো শোগুন ঘোষিত হয়।

**শোগুন শাসন**

১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সম্রাট তাকাহিরা মিনামোতো যোরিতোমাকে সেই-ই-তাই-শোগুন বা বর্বর বিজয়ী সেনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেছিলেন। পরবর্তী কালে জাপানের প্রধান সামরিক নেতাগণ শোগুন পদে নিযুক্ত হতেন। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে তোকুগাওয়া জাপানের শোগুন নিযুক্ত হন। তোকুগাওয়া জাপানে বংশানুক্রমিক শোগুন শাসন প্রবর্তন করেন। তোকুগাওয়ার সময় থেকে শোগুনরাই শাসনকার্যে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। মিকাডেরে শাসন নামমাত্র শাসনে পরিণত হয়। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীতে শোগুন কর্তৃত্বের অবসান করে মিকাডো নিজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

**সামুরাই (ভূমি-ব্যবস্থা ও সামাজিক মর্যাদা)**

দ্বাদশ শতাব্দীতে জাপান মিনামোতো-সামুরাই সামন্ত নেতৃত্বাধীনে একটি সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। জাপানের সর্বত্র সামুরাই কৃষি অঞ্চল গড়ে ওঠে। কৃষকগণ মিকাডোকে কর এবং সামুরাইদের খাজনা দিতে থাকে। সামুরাইদের ভূ-সম্পত্তির এলাকা ছিল ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি ধরনের। এই সব এলাকায় অনেক শহরের সৃষ্টি হয়। মিনামোতো পরিবার জাপানের সামরিক সংগঠন শক্তিশালী করেছিল। মিনামোতোদের আধিপত্যকালে কেবলমাত্র সামুরাইগণ অস্ত্র বহন করতে পারত। এই সময়ে সামুরাইদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

ইউরোপের শিভল্‌রির মত জাপানেরও নিজস্ব বীরধর্ম গড়ে

উঠেছিল। জাপানের বীরধর্মকে বলা হত বুসিডো। জাপানী অভিজাতদের রীতিনীতি বুসিডো দ্বারা পরিচালিত হত। অবশ্য এই রীতিনীতি ছিল অলিখিত। অভিজাত পরিবারের সন্তানগণ বংশানুক্রমে মুখে মুখে বুসিডোর রীতিনীতি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করত। শত শত বৎসরের সামন্ত-তান্ত্রিক ঐতিহ্য দ্বারা বুসিডো গড়ে উঠেছিল। মিনামোতো যোরিতোমো ছিলেন জাপানের প্রথম শোগুন। বলা হয় যে, তাঁর সময় থেকেই বুসিডো প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু যোরিতামোর অনেক আগেই জাপানী অভিজাত সমাজে বুসিডোর প্রচলন ছিল।

বুসিডো

### অনুশীলনী (১)

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** জাপানে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রথম অবস্থা আলোচনা কর। কিভাবে মিকাডো সর্বময় ক্ষমতা লাভ করে?

### অনুশীলনী (২)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) জাপানের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং চীনের প্রভাব আলোচনা কর। (২) নারা যুগের কথা লেখ। (৩) হেইওয়ান যুগের আরম্ভ কালে জাপানের অবস্থা বর্ণনা কর।

### অনুশীলনী (৩)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) তেন্নো অর্থ কি? (২) তেন সি অর্থ কি? (৩) জাপানীরা কাকে তেন সি বলত?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) শোয়েন ভূমিব্যবস্থা আলোচনা কর। (২) বৃহৎ পরিবারগুলির বিরুদ্ধে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য মিকাডো কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন? (৩) বৃহৎ পরিবার ও বৌদ্ধমঠের শক্তিবৃদ্ধি আলোচনা কর।

## অনুশীলনী (৪)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন :** (১) সামুরাইদের কথা আলোচনা কর। (২) ১০৬৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মিকাডো এবং সামুরাই সম্পর্ক কি ছিল? (৩) দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাপানের তিনটি বৃহৎ পরিবারের পরিচয় দাও।

## অনুশীলনী (৫)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন :** (১) জাপানের প্রথম শোগুন কে? শোগুন শাসন কি? (২) সামুরাইদের অধীনে ভূমিব্যবস্থা এবং সামুরাইদের সামাজিক মর্যাদা আলোচনা কর। (৩) বুসিডো কি?

### (ক) গুপ্ত পরবর্তী যুগ ( পঞ্চম-সপ্তম শতাব্দী )

গুপ্তযুগ ভারত ইতিহাসের স্বর্ণযুগ নামে পরিচিত। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রমুখ গুপ্ত সম্রাটগণের শাসনকালে সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান সাধনায় ভারত খুব উন্নতি করে।

স্কন্দগুপ্ত ছিলেন শেষ বিখ্যাত গুপ্ত সম্রাট। ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। আনুমানিক ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছিলেন।

স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ হূণগণ ভারত আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত হূণ আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন।

হূণদের গুরুত্ব

ইতিহাসে হূণদের একটি স্বতন্ত্র গুরুত্ব রয়েছে। ইউরোপে হূণ অভিযানের ফলে জার্মান উপজাতিগুলি রোমান সাম্রাজ্যে অভ্যন্তরে প্রবেশ ও বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। জার্মান উপজাতিগুলির অনুপ্রবেশ ছিল রোমান সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া থেকে যে হূণগণ অক্ষুনদী অতিক্রম করে ভারত আক্রমণ করে তারা শ্বেত হূণ নামে পরিচিত। শ্বেত হূণগণ পারস্য, কাবুল এবং উত্তর-পশ্চিম ভারত অধিকার করে। স্কন্দগুপ্ত হূণ আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সমর্থ হলেও ষষ্ঠ শতাব্দীর সূচনাতেই হূণনেতা তোরমান মালব অধিকার করেন। তোরমানের পুত্র মিহিরগুল পাঞ্জাবের সাকল বা শিয়ালকোটে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এই সময় হূণ সাম্রাজ্য পারস্য থেকে খোটান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারত ছিল হূণ সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ।

রাজপুত এবং জাঠদের বহু শাখা হূণদের বংশধর। এই ঘটনার তাৎপর্য হল হূণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতি কালক্রমে হিন্দুধর্ম ও সমাজের মধ্যে মিশে গিয়েছে।

স্কন্দগুপ্তের পর ভারতের উপর ক্রমাগত হূণ অভিযান হতে থাকে। স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটগণ দুর্বল ও শক্তিহীন ছিলেন। তাঁদের দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।

আনুমানিক ৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে মালবরাজ যশোবর্ধন মিহিরগুলকে পরাজিত করেছিলেন। পরাজিত হূণনেতা মিহিরগুল কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

## হর্ষযুগ

গুপ্ত বংশের পতনের পর পুষ্যভূতি বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধন শতদ্রু এবং যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্যের রাজধানী থানেশ্বর দিল্লীর নিকটে অবস্থিত ছিল। প্রভাকরবর্ধনের দুই পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাজ্যবর্ধন, কনিষ্ঠ পুত্রের নাম হর্ষবর্ধন এবং কন্যার নাম রাজ্যশ্রী। প্রভাকরবর্ধন গুর্জর ও হূণদের পরাজিত করেছিলেন।

কনৌজরাজ গ্রহবর্মণের সঙ্গে রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। মালবরাজ দেবগুপ্ত যুদ্ধে গ্রহবর্মণকে হত্যা করেন। রাজ্যশ্রী কনৌজের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কনৌজের কারাগার থেকে কোনমতে পলায়ন করে রাজ্যশ্রী বিন্ধ্যাচলে যান। রাজ্যবর্ধন তখন থানেশ্বরের রাজা। রাজ্যবর্ধন মালবরাজ দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। যুদ্ধে দেবগুপ্ত পরাজিত হন। এই সময় গৌড়ের রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের হস্তে নিহত হন।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন (৬০৬ খ্রীঃ)। সিংহাসনে আরোহণ করার পরেই হর্ষবর্ধন বিন্ধ্যাচলের অরণ্য থেকে ভগিনী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করেন।

রাজ্যশ্রীকে উদ্ধারের পর হর্ষবর্ধন থানেশ্বর এবং কনৌজ উভয় রাজ্যেরই রাজা হন। সিংহাসনে আরোহণের প্রথমদিকে হর্ষ শুধু মাত্র রাজপুত শীলাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। উত্তর ভারতে গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক এবং দক্ষিণ ভারতে বাতাপী রাজ্যের চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় পুলকেশী হর্ষবর্ধনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ভ্রাতার হত্যাকারী ও প্রতিদ্বন্দ্বী শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষ কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। সমৃদ্ধ গৌড় রাজ্যের উপর ভাস্করবর্মারও লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। সেজন্য ভাস্করবর্মাও শশাঙ্কের শত্রু ছিলেন। হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতের বহু রাজ্য জয় করেন। এইসব রাজ্যজয়ের পর তিনি 'উত্তরাপথনাথ' বা উত্তর ভারতে অধীশ্বর রূপে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। পূর্ব পাঞ্জাবের থানেশ্বর, উত্তর প্রদেশের কনৌজ, শ্রাবস্তী (অযোধ্যা), প্রয়াগের (এলাহাবাদ), অহিচ্ছত্রা (রোহিলাখণ্ড) হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাশ্মীর, সিন্ধু, বলভী, কামরূপ হর্ষবর্ধনের শক্তির ভয়ে ভীত ছিল। অবশ্য গৌড়ের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান বিশেষ সাফল্য লাভ করে নি। মোটকথা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে রাজকীয় ঐক্যের ধারণা উত্তর ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। দক্ষিণ ভারতে দ্বিতীয় পুলকেশী নর্মদা-তীরে হর্ষের অভিযান প্রতিরোধ করেন।



হর্ষবর্ধন

'উত্তরাপথনাথ'

হর্ষবর্ধন দানশীল ও বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। বাণভট্ট ছিলেন হর্ষের সভাকবি। হর্ষ স্বয়ং সুসাহিত্যিক ছিলেন। তিনি নাগানন্দ, রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা নামে তিনটি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। হর্ষ প্রথম জীবনে শৈব ছিলেন। পরে তিনি বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হন ও বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর

প্রয়াগে অনুষ্ঠিত মহামোক্ষপরিষদ। মহামোক্ষপরিষদ ছিল জাঁকজমকপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। কনৌজেও এই উৎসব অনুষ্ঠিত হত। আনুমানিক ৬৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হর্ষবর্ধন রাজত্ব করেন।

হর্ষবর্ধনের সঙ্গে চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। তাঁর রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারত পরিভ্রমণ করেন।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ বৌদ্ধধর্ম অনুশীলনের জন্য ভারতযাত্রা করেন। কুচা, তাসখন্দ, সমরখন্দ হয়ে তিনি পেশোয়ারের পথে ভারতে প্রবেশ করেন। হিউয়েন সাঙ ভারত সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই পুস্তকের নাম তা-তাঙ-সি-য়ু-কি।

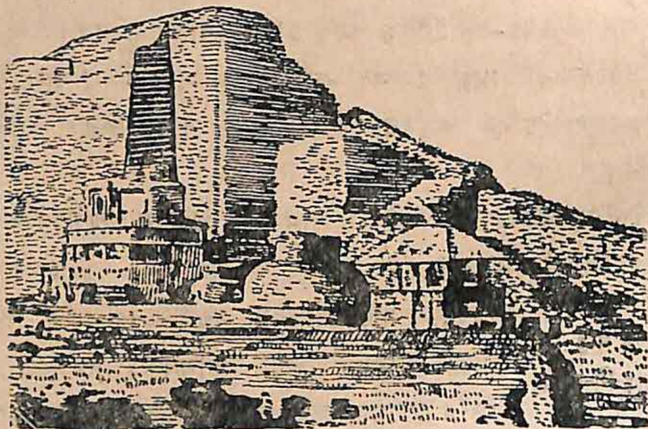
হিউয়েন সাঙ—
তা-তাঙ-সি-য়ু-কি

হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ভারত কৃষি ও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। ভারতীয়দের সাধারণ খাদ্য ছিল শস্য, দুগ্ধ, ঘি, চিনি, মিছরি ইত্যাদি। মাঝেমধ্যে ভারতীয়গণ মাছ, মাংস ইত্যাদি আহার করত। পেঁয়াজ-রসুন খুব কম ব্যবহৃত হত। গৃহস্থঘরে সাধারণত মাটির বাসনপত্র ব্যবহার করা হত, কিছু কিছু পিতলের বাসনও ছিল। অসুস্থ ব্যক্তিগণ তামার চামচ ব্যবহার করত। ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা, ছোট মুক্তা এবং কড়ি প্রচলিত ছিল। সামুদ্রিক বন্দরগুলি মূল্যবান পণ্যে বোঝাই থাকত। ভারতীয়দের নৈতিক বোধ ছিল প্রখর।

হিউয়েন সাঙ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অবস্থান করে সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। নালন্দা ছিল মহাযানী বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র। শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ হাজার ছাত্র, তিনটি বিশাল গ্রন্থাগার, ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত কক্ষ, রন্ধনাগার ইত্যাদি ছিল।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শৃংখলা ছিল



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশংসনীয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মশাস্ত্র ব্যতীত যুক্তিবিদ্যা চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ব্যাকরণ ইত্যাদির চর্চা হত।



হিউয়েন সাঙ

হর্ষবর্ধন হিউয়েন সাঙ-এর বন্ধু ও পৃষ্টপোষক ছিলেন। হিউয়েন সাঙ সম্রাট হর্ষবর্ধনের সঙ্গে কনৌজ ও প্রয়াগের ধর্মমেলা দর্শন করেন। কনৌজের মেলায় তিনি স্বর্ণ-নির্মিত বুদ্ধমূর্তি দেখেছিলেন। প্রয়াগের মেলায় পর পর তিন দিন যথাক্রমে বুদ্ধ, সূর্য ও শিবমূর্তি প্রদর্শিত হয়। এই মেলায় সম্রাট বহুমূল্য দ্রব্যাদি দান করেন।

৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ চীনে প্রত্যাবর্তন করেন।

### (খ) হর্ষ-পরবর্তী যুগ ( অষ্টম—দ্বাদশ শতাব্দী )

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর মধ্যদেশ অর্থাৎ উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকায়

বিশৃংখলা দেখা দেয়। এই বিশৃংখলার মধ্যে উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থান হয়।

হর্ষ পরবর্তী যুগে ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে রাজপুতগণ বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে হূণ প্রভৃতি যে-সব বিদেশী আক্রমণকারী ভারতে প্রবেশ করেছিল রাজপুতগণ ছিল তাদেরই বংশধর। কিছু কিছু রাজপুত বংশ অবশ্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। প্রতিহার, চৌহান ইত্যাদি রাজপুত বংশ ভারত ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। বস্তুতপক্ষে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক রাজপুত গোষ্ঠীদের ইতিহাস। রাজপুতনার সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিহার ও চৌহান ব্যতীত মেবারের শিশোদীয়, পরমার, সোলাঙ্কি ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

রাজপুত

নবম এবং দশম শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রতিহারগণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সময়ে বঙ্গদেশ পালরাজাদের শাসনাধীন থাকে। মালব, গুজরাট, কাশ্মীর আসাম ইত্যাদি অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উত্থান হয়। মাত্র ছিয়াত্তর বৎসরের মধ্যে (৭৪০—৮১৬ খ্রীঃ) কনৌজের চারজন রাজা সিংহাসনচ্যুত হন। এই ঘটনা থেকেই তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতির বিশৃংখল অবস্থা বোঝা যায়।

আনুমানিক ৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিহাররাজ ভোজ বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। তাঁর রাজধানী ছিল কনৌজ। গোয়ালিয়র, মালব, গুজরাট, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশের অধিকাংশ অঞ্চল ভোজের সময় প্রতিহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ভোজের পুত্র মহেন্দ্রপাল তাঁর পিতার সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। মহেন্দ্রপাল বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রতিহার সাম্রাজ্য উত্তর বঙ্গের পাহাড়পুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে দন্তিদুর্গ বাদামীর চালুক্য বংশ ধ্বংস

করে রাষ্ট্রকূট বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রকূট বংশের উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন ধ্রুব (৭৭৯—৭৯৩ খ্রীঃ), তৃতীয় গোবিন্দ (৭৯৩—৮১৪ খ্রীঃ) এবং অমোঘবর্ষ (৮১৪—৮৭৭ খ্রীঃ)।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে রাষ্ট্রকূট থেকে মহারাষ্ট্র নামের উৎপত্তি হয়েছে।

পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট প্রতিদ্বন্দ্বিতা

উত্তর ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য পাল, প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূট রাজাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। পালরাজ গোপাল কনৌজ জয় করে কনৌজের সিংহাসনে তাঁর আশ্রিত রাজা চক্রায়ুধকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। চক্রায়ুধ প্রতিহাররাজ নাগভট্ট কর্তৃক কনৌজ থেকে বিতাড়িত হন। চক্রায়ুধ ধর্মপালের নিকট আশ্রয় সন্ধান করেন। মুঙ্গেরের কাছে যুদ্ধে ধর্মপাল নাগভট্টের নিকট পরাজিত হন। কিন্তু নাগভট্ট দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন। যুদ্ধজয়ের শেষে তৃতীয় গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান।

প্রথম মহেন্দ্রপালের পর প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। অবশেষে ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদ প্রতিহাররাজ রাজ্যপালের নিকট হতে কনৌজ অধিকার করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহম্মদ ঘুরী আফগানিস্থান হতে ভারত অভিযান করেছিলেন। মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের সময় উত্তর ভারতে চারটি রাজপুত বংশ প্রধান হয়ে উঠেছিল : (১) দিল্লী ও আজমীরের চৌহান বংশ, (২) কনৌজের রাঠোর বংশ। (৩) গুজরাটের বাঘেল বংশ এবং (৪) বুন্দেলখণ্ডের চান্দেল্ল বংশ। এইসব রাজবংশের শাসন ছিল সামন্ততান্ত্রিক শাসন। একজন রাজার অধীনে বহু সামন্ত ভূসম্পত্তি ও অন্যান্য বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত থাকার ফলে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চৌহান বংশের রাজা পৃথ্বীরাজ বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য

ঐক্যের অভাব—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য—সামন্ত শাসন

মহম্মদ ঘুরীর বিরুদ্ধে রাজপুত রাজাদের নিকট আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কনৌজের রাঠোর বংশের রাজা জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করলেন না। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘুরীর বিরুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

## (গ) বঙ্গদেশ

**শশাঙ্ক :** প্রাচীন বাংলা রাঢ়, বরেন্দ্র, গৌড় প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। শশাঙ্ক গৌড়ের রাজা ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। কর্ণসুবর্ণ বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত ছিল।

শশাঙ্ক বাংলার বিচ্ছিন্ন জনপদগুলি ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। শশাঙ্ক প্রথম বাঙালী রাজা যিনি উত্তর ভারতের রাজনীতিতে গৌড় বা বাংলার প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন। উত্তর ভারতে শশাঙ্কের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন পুষ্যভূতিরাজ হর্ষবর্ধন। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মাও শশাঙ্কের শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত ছিলেন।

শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধনের অভিযান বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল বলে জানা যায় না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গৌড়, মগধ, দণ্ডভুক্তি, উৎকল এবং কঙ্গোদ শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত ছিল।

## পাল এবং সেনযুগে বাংলার সমাজ

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলায় ঘোর অরাজকতা দেখা দেয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি কর্তৃক বাংলা আক্রান্ত হয়। প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করে। ইতিহাসে এই অরাজকতা এবং দুর্বলের উপর প্রবলের এই অত্যাচার মাৎস্যন্যায় নামে আখ্যাত।

মাৎস্যন্যায় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বাঙালী সমাজ গভীর বুদ্ধি ও স্বার্থত্যাগের পরিচয় দেয়। বাঙালী সমাজের নেতৃস্থানীয়

ব্যক্তিগণ এক হয়ে গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচন করেন ( ৭৫০ খ্রীঃ )। গোপাল বরেন্দ্রের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বাংলায় শান্তি স্থাপন করেন। গোপাল পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

গোপালের পুত্র ধর্মপাল শক্তিশালী রাজা ছিলেন। ধর্মপালের পুত্র দেবপালের রাজত্বকালে পালবংশ গৌরব-শিখরে উন্নীত হয়।

পালরাজগণ বঙ্গদেশে চার-শ বছর রাজত্ব করেছিলেন। এত দীর্ঘকাল রাজত্বের ফলে বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতির উপর পাল-শাসনের গভীর প্রভাব পড়েছিল।

পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তথাপি পালযুগেও ব্রাহ্মণ্য আদর্শ ও সংস্কার প্রচলিত ছিল বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু বাঙালী সমাজ সম্ভবতঃ উত্তর ভারতের বর্ণব্যবস্থা অনুযায়ী কখনও গঠিত হয় নি। আর্য চতুর্বর্ণ সমাজের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে বাংলায় কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন উল্লেখ নাই। পালযুগেই কায়স্থগণ বাঙালী সমাজের একটি বর্ণরূপে গড়ে ওঠে। এই যুগে ডোম, শবর, কাপালিকগণ ছিল নিচুজাতের। ডোমেরা নগরের বাইরে কুঁড়ে বেঁধে বাস করত। তারা ছিল ব্রাহ্মণদের কাছে অচ্ছুৎ। তবে পাল সৈন্যবাহিনীতে সম্ভবত ডোম সৈনিক ছিল। "আগ ডোম, বাগ ডোম, ঘোড়া ডোম সাজে" এই সুপ্রচলিত ছড়াটির মধ্যে সেই ডোমবাহিনীর আভাস রয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন।

পালযুগে বাঙালী সামজ্য ও জীবন-যাত্রা

বাঙালীর খাদ্য ছিল ভাত, মাছ, বিভিন্ন শাক-সবজি, দুগ্ধ, ঘি, দধি, ক্ষীর ইত্যাদি। বাংলার ব্রাহ্মণগণ আমিষ আহার করতেন।

সেযুগেও পুরুষগণ ধুতি ও নারীগণ শাড়ী পরিধান করত। পুরুষেরা মালকোছা দিয়ে খাটো ধুতি পরত। মেয়েরা নানাভাবে কেশবিন্যাস করত। তারা কপালে সিঁদুর দিত, পায়ে আলতা পরত। কুঙ্কুম ইত্যাদি গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। খড়ম, চামড়ার জুতো, ছাতা ইত্যাদিরও প্রচলন ছিল।

জলপথে নৌকা এবং স্থলপথে গরুর গাড়ি ছিল সাধারণ

যানবাহন। ধনী ব্যক্তিগণ অবশ্য ঘোড়া, হাতি ইত্যাদি চেপে যাতায়াত করত। ঢাক, ঢোল, করতাল, বাঁশি ইত্যাদি ছিল বাদ্যযন্ত্র। সমাজে দাবা, পাশা ইত্যাদি খেলা এবং নৃত্য-গীত প্রচলিত ছিল।

পালযুগে বাঙালীর মনীষা শিল্প ও স্থাপত্যকীর্তির মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বাঙালী শিল্পীগণ প্রধানত অষ্টধাতু ও কষ্টিপাথর দিয়ে মূর্তি নির্মাণ করতেন। পালযুগে চিত্রশিল্পও প্রচলিত ছিল। ধীমান, বীতপাল, কর্ণভদ্র, বিমলদাস প্রমুখ ছিলেন প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত শিল্পী। স্তূপ, বিহার এবং মন্দিরের মধ্যে পালযুগের স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

ধর্ম

স্বভাবতঃই বৌদ্ধ পাল রাজাদের শাসনকালে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রভূত চর্চা হয়েছিল। বাঙালী বৌদ্ধাচার্যগণ বৌদ্ধশাস্ত্র ব্যতীত যোগ, দর্শন, জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ চর্যাপদ নামে পরিচিত তাঁদের ধর্ম-সাধনার গান রচনা করেন। এই গানগুলিই দেশীয় সাহিত্য বা বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। বৌদ্ধ সহজ সাধনার গূঢ় রহস্য ফুটিয়ে তোলার জন্য চর্যাপদের গানগুলি রচিত হয়। চর্যাপদের প্রভাবে পরবর্তীকালে বাংলার সহজিয়া, শক্তি, বাউল ও বৈষ্ণব পদাবলীর সৃষ্টি হয়।

বিদ্যাচর্চা

দেবপালের প্রধানমন্ত্রী দর্ভপাণি চতুর্বেদে পারদর্শী ছিলেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ব্যাকরণ ও কাব্যে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। পাল রাজত্বকালের বৌদ্ধ বিহারগুলির মধ্যে রাজশাহীর সোমপুর বিহার, ত্রিপুরার কনকস্তূপ বিহার, চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহার ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয় রূপে উদ্দণ্ডপুর, বিক্রমশীল এবং নালন্দা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিল। উদ্দণ্ডপুর বিহার এবং বিক্রমশীল বিহার মহারাজ ধর্মপাল কর্তৃক নির্মিত হয়। জনৈক তিব্বতরাজ উদ্দণ্ডপুর বিহারের অনুকরণে তাঁর রাজধানী লাসায় একটি বিহার নির্মাণ করেন। বিক্রমশীল বিহারের বৌদ্ধ আচার্যগণ

তিব্বতে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তিব্বতের অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষুও বিক্রমশীল বিহারে অধ্যয়ন করতেন। পাল রাজত্বকালে নালন্দা সমগ্র এশিয়ার প্রধান বৌদ্ধকেন্দ্রে পরিণত হয়। পাল সম্রাটগণ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শীলভদ্র, শান্তিরক্ষিত প্রমুখ খ্যাতিমান বাঙালী পণ্ডিতগণ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-পদ অলংকৃত করেছিলেন।

পালবংশের পতনের পর বাংলায় সেনবংশের উত্থান হয়। সেনরাজগণ ব্রহ্মক্ষত্রির ছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। সেনবংশ কর্ণাটক থেকে বাংলায় এসেছিল।

সেনযুগে বাঙালী সমাজ ও জীবনযাত্রা

"কুলজী" গ্রন্থে কৌলীন্য প্রথার কথা জানা যায়। বারেন্দ্র কুলজীর মতে সেনরাজ বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক ছিলেন। উচ্চবর্ণের বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত ছিল। কুলীনগণ সাধারণতঃ পাল্টা কুলীন ঘরের সঙ্গেই পুত্রকন্যার বিবাহ দেন। বল্লাল সেন সে সময়ের হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবনতি দেখে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। কুলীনদের নয়টি গুণ থাকা উচিত। এই নয়টি গুণ হল—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ ও দান।

সেনরাজ লক্ষ্মণসেনের প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ দুঃখ করে লিখেছিলেন যে, রাঢ় ও বারেন্দ্রের ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ করতেন না। বৈদিক মন্ত্রের তাৎপর্য ও বৈদিক অনুষ্ঠান ব্যাখ্যার জন্য হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

সেনরাজ বল্লালসেন অস্ত্র ও শাস্ত্র উভয় বিদ্যাতেই পারদর্শী ছিলেন। তিনি ব্রতসাগর, আচারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর গ্রন্থগুলি রচনা করেন। অদ্ভুতসাগর গ্রন্থটি বল্লালসেন সমাপ্ত করতে পারেন নি। তাঁর নির্দেশে তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেন গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন।

সেনরাজগণ হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। বিজয়সেন

এবং বল্লালসেন ছিলেন শিবের উপাসক। লক্ষ্মণসেন ছিলেন বৈষ্ণব। সেনরাজদের কুলদেবতা ছিলেন সদাশিব। তাঁদের মুদ্রায় সদাশিবের মূর্তি উৎকীর্ণ থাকত। সেনরাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। বল্লালসেন স্বয়ং প্রাচীন শাস্ত্র থেকে আচার-অনুষ্ঠান, দান ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দু সমাজের কর্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট শ্রাদ্ধ, তর্পণ, সন্ধ্যা বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

বিদ্যাচর্চা

লক্ষ্মণসেন বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের রাজসভার কবিদের মধ্যে জয়দেব ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। জয়দেব রচিত "গীত-গোবিন্দ" ভারতের সর্বত্র জনপ্রিয় হয়েছে। সংস্কৃত কাব্য হলেও বাংলা ও মৈথিলী পদাবলীর সঙ্গে গীতগোবিন্দের খুব মিল আছে। ধোয়ী ছিলেন লক্ষ্মণসেনের রাজ-সভার আর একজন বিখ্যাত কবি। ধোয়ী কালিদাসের বিখ্যাত "মেঘদূত" কাব্যের অনুকরণে "পবনদূত" কাব্য রচনা করেছিলেন। লক্ষ্মণসেনের প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সারা ভারতে বিস্তৃত ছিল। "সদুক্তিকর্ণামৃত" সেনযুগের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা-সংকলন। এই গ্রন্থে শ্রীধর দাস ৪৮৫ জন কবির কবিতা-সংকলন করেছিলেন। উমাপতি ধর, শরণ, গোবর্ধন এই যুগের কয়েকজন খ্যাতিমান কবি।

পাল ও সেনযুগে বাঙালী সমাজ এবং সংস্কৃতির ভিত্তি গড়ে ওঠে। পুঁথিচিত্র ও চিত্রশিল্পেও বাঙালীর অবদান স্বীকৃতি লাভ করেছিল। পুঁথিচিত্রণে খড়িমাটির সাদা, হরিতালের হলুদ, প্রদীপের শীষের কালো এবং সিঁদুরের লাল রঙ ব্যবহার করা হত।

চর্যাপদ ও প্রাচীন কাব্যে বাঙালী সমাজের দারিদ্র্যের কথাও জানা যায়। একটি গীতিতে কবি দুঃখ করে লিখেছেন, "টিলাতে বাস করি, কোন পাড়াপড়শী নেই, হাঁড়িতে নেই ভাত। সারাদিন ক্ষুধার্ত হয়ে ধুঁকছি।" আর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, "কাঠের খুঁটি নড়ছে, মাটির দেয়াল গলে পড়ছে, চালের খড়গুলি উড়ে যাচ্ছে, কেঁচোর সন্ধানে এসে ব্যাঙেরা আমার ঘর ছেয়ে ফেলেছে।"

পাল ও সেন শাসনকাল বাঙালীর গৌরবময় যুগ হলেও এই সময়েই আবার বাঙালী সমাজ ক্রমে ক্রমে পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান, তান্ত্রিকদের তুকতাক মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্য পুরোহিত শাসনে মানুষের মন ও বুদ্ধি আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। পঙ্গু ও আড়ষ্ট মানুষ সহজে দুর্বল হয়। বাঙালী সমাজের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার অনায়াসে নদীয়া জয় করেন (১২০৫ খ্রীঃ)

## (ঘ) দক্ষিণ ভারত : চালুক্য, পল্লব এবং চোলদের কীর্তি

বিন্ধ্য পর্বত থেকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত দক্ষিণ ভারত বিস্তৃত। ভারতের এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে চালুক্য পল্লব, রাষ্ট্রকূট, চোল প্রভৃতি রাজবংশের উত্থান হয়েছে।

চালুক্য : ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্য রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। চালুক্যদের রাজধানী ছিল বাতাপি বা বর্তমান বাদামি। কর্ণাটক অঞ্চলে চালুক্যদের প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে।

প্রথম পুলকেশি ছিলেন চালুক্য রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয় পুলকেশি ছিলেন চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠরাজা। উত্তর ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধন নর্মদা নদী অতিক্রম করার চেষ্টা করেন; কিন্তু তিনি দ্বিতীয় পুলকেশির নিকট পরাজিত হন। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মনও পুলকেশির নিকট পরাজয় বরণ করেছিলেন। মহেন্দ্রবর্মনের পরাজয়ের ফলে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি ভীত হয়ে দ্বিতীয় পুলকেশির বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র নরসিংহবর্মন পুলকেশির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন। যুদ্ধে পুলকেশি মৃত্যুবরণ করেন (৬৪২ খ্রীঃ)। নরসিংহবর্মন চালুক্য রাজধানী বাতাপি বিধ্বস্ত করেন।

দ্বিতীয় পুলকেশির পুত্র বিক্রমাদিত্য চালুক্যশক্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। বিক্রমাদিত্যের পর আরও কয়েকজন চালুক্য-শাসক রাজত্ব করেছিলেন। অবশেষে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্রকূট শক্তির উত্থানের ফলে চালুক্য বংশের পতন হয়।

পরবর্তীকালে হায়দরাবাদে কল্যাণীর চালুক্য-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কল্যাণীর চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তৈল। কল্যাণীর চালুক্য বংশ চোলদের বিরুদ্ধে তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল।

চালুক্য শিল্প ও স্থাপত্য

চালুক্য শিল্পকলা উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের শিল্পরীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। বিজাপুর জিলার আইহোল, পট্টদকল এবং বাদামিতে চালুক্যযুগের মন্দিরগুলি অবস্থিত। চালুক্য মন্দিরগুলির শিখর এবং বারান্দা উত্তর ভারতের স্থাপত্য রীতি অনুসারে নির্মিত। মন্দিরশিখরে দক্ষিণ ভারতীয় প্রভাবও বর্তমান এবং মন্দির নির্মাণ-কৌশলে পল্লব শিল্পকৌশল দৃষ্ট হয়। চালুক্য মন্দিরগুলি আয়তনে বৃহৎ না হলেও মন্দিরের ভাস্কর্য অপূর্ব।

**পল্লব ঃ** চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই দক্ষিণ ভারতের পল্লব রাজবংশ প্রাধান্য অর্জন করে। চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পল্লবরাজ শিবস্কন্ধবর্মন অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। শিবস্কন্ধবর্মনের অন্যতম উত্তরাধিকারী বিষ্ণুগোপ গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে পল্লব বংশের ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় না।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণু পল্লব বংশের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সিংহবিষ্ণুর পুত্র মহেন্দ্রবর্মন (৬০০-৬৩০ খ্রীঃ) চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশির নিকট যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র নরসিংহবর্মন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তিনি দ্বিতীয় পুলকেশিকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। পুলকেশি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। নরসিংহবর্মন চালুক্য রাজধানী বাদামি ধ্বংস করেন।

নরসিংহবর্মন পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের চোল, পাণ্ড্য ও চের রাজ্য জয় করেন। শ্রীলঙ্কার সিংহাসনেও তাঁর মনোনীত শাসক অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

নরসিংহবর্মনের মৃত্যুর পরও পল্লবরাজগণ চালুক্যদের বিরুদ্ধে

যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্রকূট শক্তির উত্থানের ফলে বাদামির চালুক্য বংশের অবসান হয়। অতঃপর দক্ষিণ ভারতে পল্লব ও রাষ্ট্রকূট এই দুই শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। দীর্ঘকাল ধরে চালুক্য এবং রাষ্ট্রকূটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে পল্লব বংশের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছিল। অবশেষে নবম শতব্দীর শেষভাগে চোলরাজ আদিত্য দুর্বল পল্লব রাজ্য জয় করেন।

পল্লবরাজদের রাজধানী ছিল কাঞ্চী। পেনার এবং তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণে পল্লবগণই সর্বপ্রথম একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। পল্লব প্রাধান্য শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। পল্লব শাসনকালে বৈষ্ণব আলবার এবং শৈব নায়নারদের আবির্ভাব হয়েছিল। আলবারগণ রচিত স্তোত্র তামিলনাড়ুর অধিবাসিগণ আজও উৎসব-অনুষ্ঠানে, বিবাহ ও শবযাত্রায় উচ্চারণ করে। শৈব নায়নারগণও বহু ধর্মীয় পুস্তক রচনা করেছিলেন। পল্লব শাসনকালে কাঞ্চী একটি প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের চর্চা হত।

পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মন 'মত্তবিলাস' প্রহসন রচনা করেন। তিনি গুহা-স্থাপত্যও প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর পুত্র নরসিংহবর্মন মহামল্লের নামানুসারে মামল্লপুরম বন্দরের নামকরণ হয়েছে। মামল্লপুরমের বিখ্যাত রথ-মন্দিরগুলির কয়েকটি মন্দির নরসিংহ-বর্মনের রাজত্বকালে নির্মিত হয়।

পল্লব শিল্প ও স্থাপত্য

মামল্লপুরম মাদ্রাজের ৫৬ কিলোমিটার দক্ষিণে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। মামল্লপুরমের পল্লব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কীর্তিগুলি চারভাগে ভাগ করা যায়। (ক) স্তম্ভ-বিশিষ্ট বৃহৎ কক্ষ। কক্ষগুলিতে পল্লব রাজা ও রানীদের মূর্তি রক্ষিত আছে। কক্ষগুলি মন্দির রূপে ব্যবহৃত হত। (খ) পাথর কেটে নির্মিত পাঁচটি রথ-মন্দির। (গ) সমুদ্রতীরে অবস্থিত "সৈকত মন্দির" ও অন্যান্য মন্দির। (ঘ) প্রস্তর ভাস্কর্য।

কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দির এবং বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দিরও পল্লব-

রাজগণের শিল্প-কীর্তি পরিচয় বহন করে। অষ্টম শতাব্দীতে এই দুটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

**চোল ঃ** চোলগণ শক্তিশালী শাসক ছিলেন। মৌর্য সম্রাট অশোকের অনুশাসনে চোলদের উল্লেখ আছে।

নবম শতাব্দীতে বিজয়ালয় (৮৪৬-৮৭১ খ্রীঃ) চোলশক্তিকে দক্ষিণ ভারতে একটি শক্তিশালী বংশ রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য অর্জনের জন্য চোলগণ অঙ্গ, পাণ্ড্য, পল্লব প্রভৃতি শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল।

চোলরাজ প্রথম আদিত্য (৮৭১-৯০৭ খ্রীঃ) পল্লবদের পরাজিত করেন। পল্লব শাসন অপসৃত হবার পর চোলদের রাষ্ট্রকূট শক্তির মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়।

আদিত্যের উরাধিকারী প্রথম পরন্তক পাণ্ড্যরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি পাণ্ড্যরাজকে পরাজিত করেন এবং পাণ্ড্য রাজধানী মাদুরা অধিকার করেন। পরন্তক শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেও যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন।

চোলরাজ রাজরাজদেব (৯৮৫-১০১৬ খ্রীঃ) এবং তাঁর পুত্র রাজেন্দ্রদেব চোলের (১০১৬-১০৫৫ খ্রীঃ) রাজত্বকালে চোলশক্তি সর্বাধিক প্রাধান্য অর্জন করে।

রাজরাজদেব চালুক্য রাজ্য এবং কলিঙ্গ জয় করেছিলেন। পাণ্ড্য, চের প্রভৃতি তামিল রাজ্য রাজরাজদেবের অধিকারভুক্ত হয়। রাজরাজদেব শ্রীলঙ্কার উত্তর ভাগ এবং আরব সাগরের কয়েকটি দ্বীপের উপর তাঁব আধিপত্য বিস্তার করেন।

সামুদ্রিক কার্যকলাপ

রাজেন্দ্রদেব চোল পূর্ব ভারতের উপকূল ধরে বিজয় অভিযানে অগ্রসর হন। তিনি বঙ্গদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। এই অভিযানে পথে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা রাজেন্দ্রদেব চোলের প্রতি তাদের আনুগত্য জ্ঞাপন করে। পালরাজ মহীপাল রাজেন্দ্রদেব চোলের নিকট পরাজিত হন। গাঙ্গেয় অঞ্চল বিজয় উপলক্ষে রাজেন্দ্রদেব

চোল "গঙ্গাইকোণ্ড" উপাধি গ্রহণ করে। তিনি গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরম নামে একটি নতুন রাজধানীও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রাজেন্দ্রদেব চোলের দুর্ধর্ষ নৌবাহিনী শ্রীলঙ্কা জয় করে। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জও এই নৌবাহিনী কর্তৃক বিজিত হয়। রাজেন্দ্রদেব চোলের দিগ্বিজয়ী নৌবাহিনী মালয় উপদ্বীপের এবং ইন্দোনেশিয়ার শৈলেন্দ্ররাজ শাসিত রাজ্যের উল্লেখযোগ্য অংশ জয় করেছিল।

রাজেন্দ্রদেবের পর চোল বংশের পতন আরম্ভ হয়।

চোল শাসনব্যবস্থা অতি নিপুণ ছিল। শাসনব্যবস্থায় রাজার স্থান ছিল সবার উপর। রাজা মন্ত্রিসভার পরামর্শ নিয়ে রাজ্যশাসন করতেন। অবশ্য রাজা মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য বাধ্য ছিলেন না।

শাসনব্যবস্থার মূলে ছিল কুর্রম বা গ্রাম। গ্রামগুলির সমবায়ে নাড়ু বা জিলা গঠিত হত। কয়েকটি জিলা নিয়ে গঠিত হত মণ্ডলম্ বা প্রদেশ। রাজপরিবারের লোক প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন।

স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান চোল শাসন-ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। এইসব প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ এক বৎসরের জন্য নির্বাচিত হতেন। গ্রামে পঞ্চায়েতী শাসন প্রচলিত ছিল। গ্রামের জমি জরিপ করে ফসল উৎপাদন-ক্ষমতা অনুসারে জমি ভাগ করা হয়েছিল। জমির ফসল উৎপাদন-ক্ষমতা বিচার করে জমির খাজনা স্থির করা হত। জমির রাজস্বই ছিল রাজ্যের অর্থাগমের প্রধান উৎস।

চোলরাজাদের বিচার-ব্যবস্থাও উন্নত ছিল। গ্রামেও বিচারালয় ছিল। অপরাধীদের কঠিন শাস্তি পেতে হত।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কীর্তির জন্যও চোলরাজগণ বিখ্যাত ছিলেন। রাজরাজ নির্মিত তাঞ্জোরের বৃহদেশ্বর শৈবমন্দির চোল শাসনকালের একটি বিশিষ্ট স্থাপত্যকর্ম। চোলযুগে দক্ষিণ ভারতের মন্দির-শিল্পে গোপুরম্ এবং মণ্ডপ-রীতি প্রবর্তিত হয়। গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরমের ধ্বংসের উপর দণ্ডায়মান মন্দিরটিও চোল-শিল্পসাধনার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

## অনুশীলনী (১)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) শেষ বিখ্যাত গুপ্তসম্রাট কে? (২) কত খ্রীষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন? (৩) তোরমান কে?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) ইতিহাসে হূণদের গুরুত্ব কি? (২) তোরমান এবং মিহিরকুলের ভারত অভিযান আলোচনা কর।

## অনুশীলনী (২)

**বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ** (১) হর্ষবর্ধন কোন্ বংশের রাজা ছিলেন? (২) হর্ষবর্ধনের সময়কার গৌড়ের রাজার নাম কি? (৩) কে 'উত্তরাপথনাথ' নামে পরিচিত ছিলেন?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যসীমা বর্ণনা কর। (২) সাহিত্যিক রূপে হর্ষবর্ধনের পরিচয় দাও।

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** হর্ষবর্ধনের কথা আলোচনা কর।

## অনুশীলনী (৩)

**বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ** (১) হর্ষবর্ধনের শাসনকালে কোন্ চৈনিক পরিব্রাজক ভারত পরিভ্রমণ করেন? (২) হিউয়েন সাঙ রচিত ভারতবিষয়ক পুস্তকের নাম কি?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ থেকে ভারত সম্পর্কে কি জানা যায়? (২) নালন্দা বিশ্ববিত্থালয়ের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

## অনুশালনী (৪)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) রাজপুতদের আবির্ভাব কিভাবে হল? কয়েকটি রাজপুত বংশের নাম বল। (২) প্রতিহারদের কথা আলোচনা কর.।

## অনুশালনী (৫)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) পাল-প্রতিহার রাষ্ট্রকূট প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্ণনা কর। (২) মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের সময় উত্তর ভারতে রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা কর।

## অনুশালনী (৬)

**বিষয়মুখা প্রশ্ন ঃ** (১) কোন্ বাঙালী রাজা সর্বপ্রথম উত্তর ভারতের রাজনীতিতে গৌড় বা বাংলার প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন? (২) পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) ইতিহাসে শশাঙ্কের ভূমিকা কি ? (২) মাৎস্যন্যায় কি ? (৩) কিভাবে গোপাল রাজা হয়েছিলেন ?

### অনুশীলনী (৭)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) পালযুগের বাঙালী সমাজ ও জীবনযাত্রা বর্ণনা কর। পালযুগের ধর্ম ও বিদ্যাচর্চা আলোচনা কর।

### অনুশীলনী (৮)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) সেনযুগের বাঙালী সমাজ ও জীবনযাত্রা বর্ণনা কর। (২) সেনযুগের ধর্ম ও বিদ্যাচর্চা আলোচনা কর।

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** বাঙালী সমাজ গঠনে পাল ও সেন যুগের প্রভাব আলোচনা কর।

### অনুশীলনী (৯)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) চালুক্য বংশের উত্থান ও পতনের ইতিহাস লেখ। (২) চালুক্য শিল্প ও স্থাপত্য আলোচনা কর।

### অনুশীলনী (১০)

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** পল্লব বংশের উত্থান ও পতনের কাহিনী লেখ।

### অনুশীলনী (১১)

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** পল্লব শিল্প ও স্থাপত্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

### অনুশীলনী (১২)

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** চোলদের ইতিহাস আলোচনা কর। চোল শক্তির সামুদ্রিক কার্যকলাপের বিবরণ দাও।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) চোল শাসনব্যবস্থা বর্ণনা কর। (২) চোল শিল্প-সাধনার পরিচয় দাও।

## দ্বাদশ অধ্যায় | ভারতের বৈদেশিক যোগাযোগ

সুদূর অতীত কালেই ভারতের সঙ্গে মধ্য এশিয়া, তিব্বত, শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সূত্র ছিল ধর্ম ও বাণিজ্য। ভারতের বৌদ্ধধর্ম মধ্য এশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও তিব্বত গ্রহণ করেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। ভারতীয় বণিকগণও এইসব দেশে বাণিজ্য উপলক্ষে যাতায়াত করত।

**বৃহত্তর ভারত**

ভারতীয় ধর্মপ্রচারক এবং ভারতীয় বণিকদের প্রভাবে মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে গড়ে উঠেছিল বৃহত্তর ভারত। বৃহত্তর ভারতের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় ভাষা, লিপি, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উড়ে উঠেছিল ভারতীয়দের বাজার ও বাসস্থান। আজও এইসব দেশে ভারতীয় শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্য এশিয়ার তাকলামাকান মরুভূমি খনন করে বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহার, বৌদ্ধ ও হিন্দুর দেবদেবী মূর্তি, ভারতীয় ভাষা ও লিপিতে লিখিত পুঁথি ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই অঞ্চল সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্যার অরেলস্টেইন বলেন যে, অঞ্চলটি দেখার সময় তাঁর মনে হয়েছিল যে তিনি যেন প্রাচীন ভারতেই একটি নগরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি স্থলপথ এবং জলপথ এই দুই পথেই প্রসার লাভ করে। স্থলপথে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রধানতঃ মহাযান

**স্থলপথ**

বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় করে মধ্য এশিয়ায় প্রবেশ করে। কুষাণ সম্রাণ সম্রাট কণিষ্কের শাসনকালে বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার সৃষ্টি হয়। মহাযান মতে বুদ্ধ দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হন এবং বুদ্ধের মূর্তিপূজা আরম্ভ হয়। বৌদ্ধধর্মের অপর শাখা হীনযান নামে পরিচিত হয়। হীনযানপন্থীরা বুদ্ধের মূর্তিপূজা

করেতন না। তাঁরা বুদ্ধকে জ্ঞানী শিক্ষক রূপে গ্রহণ করে তাঁর মতবাদ অনুসরণ করে চলতেন। কনিষ্কের পূর্বে মৌর্য সম্রাট অশোক বুদ্ধের শিক্ষা ও মতবাদই বিদেশে প্রচার করেছিলেন।

মধ্য এশিয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম চীনে এবং চীন থেকে কোরিয়া হয়ে জাপানে প্রবেশ করে।

কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক এবং ভারতীয় ধর্মপ্রচারকদের প্রভাবে মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতিগুলি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। মধ্য এশিয়ার খোটান, কাশগড় প্রভৃতি স্থান কনিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ক্রমে ক্রমে কাস্পিয়ান সাগর থেকে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবাধীন হয়।

কুষাণযুগ ভারত ইতিহাসের এক বিচিত্র ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ভেবে বিস্মিত হতে হয় যে, দু-হাজার বছরেরও আগে কিভাবে কুষাণ সম্রাটদের শাসনকালে উত্তর ভারত, মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং পূর্ব ইরাণ এই বিশাল অঞ্চল জুড়ে একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিরাট সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের ভাষা আলাদা, ধর্ম আলাদা, আচার-অনুষ্ঠান, জীবন-যাত্রা সবই আলাদা। তথাপি কুষাণ সম্রাটদের সুনিপুণ শাসনে তারা একই সাম্রাজ্য মধ্যে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করত। রোম, পার্থিয়া এবং চীনের সঙ্গে কুষাণ যুগের ভারত প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাসে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যরূপে পরিগণিত হয়।

শুধু তাই নয়। কুষাণযুগে ভারত সমসাময়িক উন্নত সমাজ ও দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। চীন থেকে রোমান সাম্রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তসীমা ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবীর প্রথম আন্তঃমহাদেশীয় পথ কুষাণ সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়েই স্থাপিত হয়েছিল। এই পথ আজও "রেশম পথ" নামে বিখ্যাত। কারণ এই পথ দিয়েই চীনের রেশম ও রেশমজাত বস্ত্রাদি ভূমধ্যসাগরের তীর পর্যন্ত আনা হত।

কুষাণ সভ্যতা শুধুমাত্র ভারতীয় ইতিহাসকে প্রভাবান্বিত করে নি। এই সভ্যতা মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের সমাজ ও জনজীবনের উপর স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। আজ পর্যন্তও এইসব দেশে কুষাণ সভ্যতার নিদর্শন, অথবা জনজীবনে কুষাণ সভ্যতার প্রভাব খুবই স্পষ্ট।

মধ্য এশিয়ার কুষাণ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি বর্তমানে সোভিয়েট দেশের অন্তর্ভুক্ত। ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঐ অঞ্চলে কৃষিব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়। কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের প্রয়োজন। জমিতে জলসেচের জন্য সোভিয়েট সরকার এই অঞ্চলে অনেক খাল কেটেছে। এই সব খাল কাটার আগে দু-হাজার বৎসর পূর্বে কুষাণরা যে খালগুলি মধ্য এশিয়ায় খনন করেছিল তাই ছিল মধ্য এশিয়ার কৃষির উন্নতির কারণ। কুষাণদের কাটা অনেক খাল সোভিয়েট শাসনকালে সংস্কার করা হয়েছে।

পাকিস্তানের জাতীয় পোশাক শালওয়ার এবং শেরওয়ানীর উপর কুষাণ পোশাক-পরিচ্ছদের প্রভাব সুস্পষ্ট। পাকিস্তানে প্রচলিত চপ্পল, মাথায় পাখার মত ভাঁজ ভাঁজ পাগড়ি, জল বয়ে আনার জন্য বিশেষ আকারের জলপাত্র ইত্যাদিও কুষাণ প্রভাবের পরিচয় বহন করছে। পাকিস্তানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তক্তি নামে পরিচিত যে কাষ্ঠাসন প্রচলিত রয়েছে তা-ও কুষাণযুগে প্রচলিত ছিল। কুষাণ শাসনকালে ব্যবহৃত বিশেষ আকৃতির চেয়ার আজও পাকিস্তানের ডেরা ইসমাইল খানের দোকানগুলিতে তৈরী করা হয়।

১৯৫৯ সাল থেকে জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় আফগানিস্তানে খনন কার্য পরিচালনা করে কুষাণযুগের বহু নিদর্শন আবিষ্কার করেছে।

খোটান ছিল বৌদ্ধ ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। খোটান

মধ্য এশিয়ার পূর্ব তুর্কীস্থানে কুয়েনলুন পর্বতের উত্তরে এবং তাকলামাকান মরুভূমির দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। ভারতের বৌদ্ধ পণ্ডিত আর্য বিরোচন খোটানের রাজার শিক্ষাগুরু ছিলেন। খোটানীদের বিশ্বাস অনুসারে সম্রাট অশোকের পুত্র খোটানে এসেছিলেন এবং একটি ভারতীয় রাজবংশ দীর্ঘকাল খোটানে রাজত্ব করেছিল। ২১১ খ্রীষ্ট—পূর্বাব্দে সর্বপ্রথম খোটানে একটি বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়।

খোটান

সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারত থেকে পামির পর্বতমালা অতিক্রম করে কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তখন পর্যন্ত খোটানের সমৃদ্ধি বজায় ছিল এবং খোটানে বহু বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল। অনেকে চীনা বৌদ্ধ শিক্ষা-লাভের জন্য ভারত পর্যন্ত না এসে খোটানে শিক্ষাগ্রহণ করতেন।

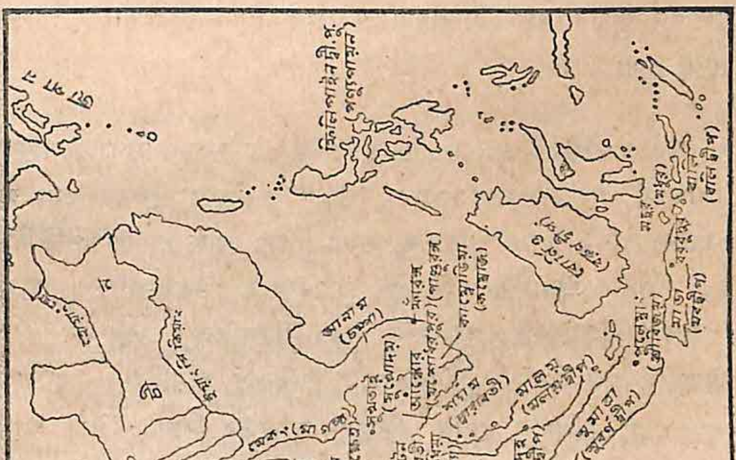
হিউয়েন সাঙ-এর সাক্ষ্য

খোটান থেকে বৌদ্ধধর্ম পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। চীনা তুর্কীস্তানের অন্তর্ভুক্ত প্রাধন চারিটি রাজ্য ছিল ভরুক, কুচা, অগ্নিদেশ (কারাসর) এবং কাও সাঙ (তুর্ফান)। চাকু ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী রাজ্য। চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে কুচা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। চৈনিক সূত্রে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কুচায় প্রায় একহাজার বৌদ্ধস্তূপ ও মন্দির ছিল। কুচার বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বৌদ্ধশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। তুর্ফান রাজ্যের উইগুর তুর্কগণ একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিখ্যাত মোঙ্গল নায়ক চেংগিজ খানও বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিলেন। আজও মধ্য এশিয়া, চীন, কোরিয়া, জাপান ও মঙ্গোলিয়ায় অগণিত নরনারী বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করে।

দুর্গম তিব্বতেও বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বত একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। তৎকালীন তিব্বতরাজ স্রঙ-

সাঙ গাম্পো চীন ও নেপালের রাজপরিবারে বিবাহ করেন। সম্ভবতঃ তিনি তাঁর রাণীদের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। খোটানে তখন ভারতীয় লিপি প্রচলিত ছিল। স্রঙ-সাঙ গাম্পো খোটানের ভারতীয় লিপি তিব্বতে প্রচলিত করেন। বাংলায় পাল শাসন-

তিব্বত—অতীশ দীপঙ্কর



বিদেশে ভারতীয়দের বসতি স্থাপন

কালে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। বহু তিব্বতী নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে, অধ্যয়ন করত।

একাদশ শতাব্দীতে পালরাজ নয়াপালের রাজত্বকালে তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে বিক্রমশিলা মহাবিহারের মহাচার্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতযাত্রা করেন। তিনি তের বৎসর তিব্বতে ছিলেন। ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তিব্বতেই দীপঙ্কর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিব্বতের মন্দির ও গুম্ফায় ভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্রের অমূল্য গ্রন্থগুলি রক্ষিত আছে। দীপঙ্কর কর্তৃক পালরাজ নয়াপালকে লিখিত পত্রের তিব্বতীয় অনুবাদও তঞ্জুর নামক তিব্বতীয় সংকলন-গ্রন্থে দেখা যায়।

অতীশ দীপঙ্কর এবং অন্যান্য ভারতীয় প্রচারকগণ তিব্বতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁরা তিব্বতে যেসব ধর্মসংস্কার করেন, তারই উপর তিব্বতের বর্তমান লামা বৌদ্ধ ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের তিব্বত যাত্রাকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। এই সব অঞ্চল ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী তুর্কীদের দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল। ধর্মরক্ষার জন্য মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ভারতের বিহারগুলিতে আশ্রয় সন্ধান করেন। বঙ্গদেশ ছিল ভারতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শেষ আশ্রয়স্থল।

স্থলপথ ব্যতীত জলপথেও ভারতের সঙ্গে বাইরের দশের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ইন্দোনেশিয়া, কম্বুজ ( কাম্বোডিয়া, ) ভিয়েৎনাম, মালয়, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে অতি প্রাচীনকাল থেকেই সমুদ্রপথে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। বৈদেশিক সূত্র, যেমন অজ্ঞাত নামা গ্রীক নাবিক কর্তৃক লিখিত "পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সী" গ্রন্থ অথবা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, যেমন জাতক কাহিনী, কথাসরিৎসাগর গ্রন্থে "সুবর্ণভূমি"র উল্লেখ রয়েছে।

সমুদ্রপথ

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় বণিকগণ সুবর্ণভূমি বা সুবর্ণদ্বীপের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। সুবর্ণভূমি যে বিশেষ

কোনো দেশ তা নয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব অঞ্চলই প্রাচীন যুগে সুবর্ণভূমি বা সুবর্ণদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। ভারতীয় বণিকগণ অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে মশলা ও অন্যান্য দ্রব্যের বাণিজ্য করত। বাণিজ্য থেকে প্রচুর লাভহত বণিকদের। তাই তারা এই অঞ্চলের মাটিকে বলত সোনার মাটি বা সুবর্ণভূমি।

সুবর্ণভূমি

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টোলেমি কর্তৃক রচিত ভূগোল থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু বন্দরের নাম জানা যায়। নামগুলি ভারতীয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দরগুলির ভারতীয় নাম প্রমাণ করে যে এই সময়ে বহু ভারতীয় বণিক সুবর্ণভূমি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। এবং শুধু বণিকগণই নয়, প্রাচীন এবং মধ্যযুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ভারতীয় রাজবংশ রাজত্ব করত। এই অঞ্চলের উপর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব ছিল অপরিসীম। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশে সংস্কৃত পুঁথি ও অনুশাসন, বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ, বুদ্ধ এবং হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, ভারতীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নিদর্শন ইত্যাদি পাওয়া গেছে। ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণের কাহিনী আজও অত্যন্ত জনপ্রিয়।

বসতি স্থাপন—
সাংস্কৃতিক প্রভাব

খ্রীষ্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে কম্বুজে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কম্বুজ রাজ্যের প্রাধান্যের দিনে সমগ্র কাম্বোডিয়া, লাওস, কোচিন-চীন, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ ও মালয় উপদ্বীপের কিয়দংশ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কম্বুজরাজ সপ্তম জয়বর্মন অংকোরথোম (নগরধাম?) নগর পুনঃ নির্মাণ করেন। অংকোরথোমের প্রাচীন নাম ছিল যশোধরপুর। নবম শতকে যশোধরপুর প্রথম নির্মিত হয়। অংকোরভটের বিষ্ণুমন্দির কম্বুজ রাজবংশের একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। অংকোরভট মন্দির পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যশিল্পরূপে পরিগণিত হয়। কম্বুজরাজ জয়বর্ধন দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করেছিলেন। জয়বর্মন কর্তৃক নির্মিত

যশোধরপুর—
অংকোরভট—
অংকোরথোম

অংকোরথোম নগর ছিল প্রাচীর বেষ্টিত। প্রত্যেক দিকে নগরের প্রাচীর ত্ু-মাইল বিস্তৃত ছিল। নগরের কেন্দ্রে ছিল বেয়ন মন্দির। অংকোরভট মন্দির অংকোরথোম নগরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

কম্বুজ রাজ্যে বহু সংস্কৃত অনুশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আনামী এবং থাই আক্রমণে কম্বুজের শক্তি খর্ব হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও সপ্তম জয়বর্মন যশোবর্মন এবং দ্বিতীয় সূর্যবর্মন কম্বুজের শক্তিশালী রাজা ছিলেন।

চম্পা

প্রাচীন হিন্দুরাজ্য চম্পা বর্তমান ভিয়েৎনামে অবস্থিত ছিল। আধুনিক আনাম চম্পার অন্তর্গত ছিল। চম্পায় বহু হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দির ছিল। তের-শ বছরের বেশী (আনুমানিক ১৫০-১৪৭১) চম্পার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে মোঙ্গল আক্রমণে চম্পার পতন হয়।

মালয়

গুপ্তযুগের শেষদিকে মালয়ে ভারতীয়দের বসতি স্থাপনের কথা জানা যায়। পঞ্চম শতাব্দীর কয়েকটি অনুশাসন থেকে জানা যায় যে, ভারতীয়গণ মালয়ে রাজ্য স্থাপন করেছিল। অষ্টম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

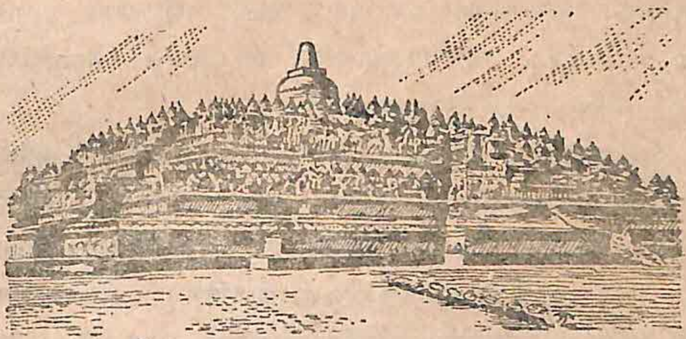
**জাভা :** খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জাভা, বালী, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপ এবং মালয় উপদ্বীপে যবদ্বীপ বা জাভার শৈলেন্দ্র বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। শৈলেন্দ্র বংশের শাসকগণ মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিলেন। বাঙালী বৌদ্ধ কুমার ঘোষ জনৈক শৈলেন্দ্র বংশীয় মহারাজের গুরুর পদ অলংকৃত করেন। সে সময় বঙ্গদেশ ছিল মহাযান বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র। শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব নালন্দায় বিহার নির্মাণ করেন। তিনি বিহার পরিচালনার জন্য পালরাজ দেবপালের নিকট পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করেন। দেবপাল এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন।

শৈলেন্দ্ররাজগণ ভারত এবং চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। আরব বণিকদের বিবরণ থেকে শৈলেন্দ্র বংশের ঐশ্বর্যের কথা জানা যায়। জনৈক শৈলেন্দ্ররাজ প্রত্যহ একটি স্বর্ণ

নির্মিত ইস্টক সমুদ্রে নিক্ষেপ করতেন। একটি আরব সূত্র থেকে জানা যায় যে, নবম শতাব্দীর একজন শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজার দৈনিক রাজস্ব আয় ছিল দু-শ মণ সোনা।

বরবুদুর

জাভার শৈলেন্দ্র বংশের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বরবুদুর স্তূপ নির্মাণ। ভারতের বাইরে কোথাও এত বড় স্তূপ আবিষ্কৃত হয় নি। বিশাল স্তূপটিতে বুদ্ধ ও বুদ্ধের জীবনের কাহিনী অবলম্বনে বহু মূর্তি খোদিত আছে।



বরবুদুর

বরবুদুর পাহাড়ের উপর নির্মিত। নিচ থেকে উপর পর্যন্ত নয়টি স্তর। সবার উপরে ঘণ্টাকৃতি স্তূপ।

একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত শৈলেন্দ্র বংশ সগৌরবে রাজত্ব করে। অতঃপর দক্ষিণ ভারতের চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্র চোলের (১০১২-১০৪৪ খ্রীঃ) আক্রমণে শৈলেন্দ্র বংশের পতন আরম্ভ হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র রাজশক্তির অবসান হয়।

শৈলেন্দ্র বংশের পতনের পর বিজয় নামে রাজা পূর্ব যবদ্বীপে একটি হিন্দু রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল তিক্তবিল্ব। তিক্তবিল্বের যবদ্বীপিয় নাম মজপহিত। চতুর্দশ শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপ এবং ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপ মজপহিত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইসলাম অনুগামীদের আগমন হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে

মজপহিতরাজ ইসলাম ধর্মের অনুগামীদের দ্বারা বিতাড়িত হন। বিতাড়িত বিন্দু রাজপরিবার বহু হিন্দু অনুগামীদের সঙ্গে বালী দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আজও বালী দ্বীপে হিন্দু সংস্কৃতি বর্তমান।

ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব অপরিসীম। ওয়াজঙ নামে আখ্যাত ইন্দোনেশিয়ার ছায়া-নাটকের কাহিনী রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান অবলম্বন করে রচিত হয়। সুকর্ণ, রত্না ইত্যাদি ইন্দোনেশীয় নামের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায়। ইন্দোনেশিয়ার বিমান ভারতের পক্ষীদেবতা গরুড়ের নামে নামাঙ্কিত। "বাহাসা ইন্দোনেশিয়া" অর্থাৎ ইন্দোনেশীয় ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রভাব দেখা যায়।

প্রায় দেড়হাজার বছর ধরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করেছে। ভারতের হিন্দু শক্তিগুলি ইসলামের নিকট বিজিত হওয়ার পরও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে হিন্দু এবং বৌদ্ধ রাজবংশ রাজত্ব করেছিল। এই অঞ্চলের আদি অধিবাসীরা উন্নততর ভারতীয় সংস্কৃতির স্পর্শ লাভ করে তাদের জীবনধারা গড়ে তুলেছিল। অনেকের ধারণা যে, হিন্দুধর্ম অন্য জাতি ও সংস্কৃতির লোককে আপন করে নিতে পারে না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, এই ধারণা কত ভুল।

## অনুশীলনী (১)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) স্যার অরেল স্টেইন কে? (২) কার শাসন কালে বৌদ্ধধর্মের শাখার সৃষ্টি হয়?

**মানচিত্র বিষয়ক প্রশ্ন ঃ** (১) মানচিত্রে তাকলামাকান মরুভূমি প্রদর্শন কর। (২) হিউয়েন সাঙ্-এর প্রত্যাবর্তন-পথ প্রদর্শন কর।

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) বৃহত্তর ভারত বলতে কি বোঝা যায়? স্থলপথে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসারের কথা আলোচনা কর। (৩) খোটানের বৌদ্ধ সংস্কৃতির পরিচয় দাও।

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** খোটান এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বৌদ্ধ প্রভাব আলোচনা কর। এই প্রসঙ্গে হিউয়েন-সাঙ-এর সাক্ষ্য উল্লেখ কর।

## অনুশীলনী (২)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) কোন তিব্বত-রাজ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন? (২) তিব্বতের লিপি কোন্ দেশের লিপি দ্বারা প্রভাবান্বিত? (৩) তঞ্জুর কি?

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের কথা আলোচনা করা। এই প্রসঙ্গে অতীশ দীপঙ্করের অবদান উল্লেখ কর।

## অনুশীলনী (৩)

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) কোন্ কোন্ সূত্র থেকে "সুবর্ণ ভূমির" কথা জানা যায়? (২) "সুবর্ণভূমি" বলতে কি বুঝায়? (৩) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের বসতি স্থাপন এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব আলোচনা কর।

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** কম্বুজ, চম্পা এবং মালয়ে ভারতীয় প্রভাবের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

## অনুশীলনী (৪)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) শৈলেন্দ্র বংশের শাসনকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত ছিল? (২) বরবুদুর কি? (৩) বরবুদুর কোথায় অবস্থিত? (৪) তিক্তবিল্ব কার রাজধানী? (৫) তিক্তবিল্বের যবদ্বীপিয় নাম কি? (৬) ওয়াজং কি?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) শৈলেন্দ্রে বংশের ইতিহাস আলোচনা কর। (২) বরবুদুর বিখ্যাত কেন?

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** জাভায় ভারতীয় প্রভাবের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

## ত্রয়োদশ অধ্যায় | দিল্লীর সুলতানী শাসন (১২০৬-১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ)

একাদশ শতাব্দীর আরম্ভকাল থেকে ভারতে তুর্ক-আফগান অভিযান শুরু হয়। এই অভিযানকারীদের তুর্ক-আফগান বলা হত। কারণ অভিযানকারীরা ছিল মধ্য এশিয়ার তুর্কী জাতির শাখা এবং আফগানিস্থানের গজনী, ঘুর ইত্যাদি স্থান থেকে এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। প্রথম অভিযানকারী ছিলেন সুলতান মামুদ (৯৯৭-১০৩০ খ্রীঃ)। সুলতান মামুদ আফগানিস্থানের সুলতান ছিলেন।

*তুর্ক-আফগান আগমন*

মামুদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। তাঁর আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন। ভারতে রাজ্যস্থাপন মামুদের উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতের ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্যের লোভেই তিনি বারবার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিক ইবন-উল-আথির মামুদের অর্থলোভ ও লুণ্ঠনকার্যের নিন্দা করেছেন। মামুদের নিকৃষ্ট অপকীর্তি হল গুজরাটের সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন। ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করে প্রায় দু' কোটি স্বর্ণমুদ্রা ও অন্যান্য বহু মূল্যবান জিনিস নিয়ে গজনী ফিরে যান। অপর আক্রমণকারী মহম্মদ ঘুরী ছিলেন আফগানিস্থানের গজনী এবং হীরাটের মধ্যবর্তী ঘুরের অধিবাসী। ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘুরের শাসক গিয়াসউদ্দিন গজনী কাবুল অধিকার করেন। মহম্মদ ঘুরী ছিলেন গিয়াসউদ্দিনের ভ্রাতা। ভারতে রাজ্যস্থাপন ছিল মহম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য। ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী মুলতান অধিকার করেন। পরে তিনি পাঞ্জাব জয় করেন। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরী দিল্লীর চৌহানরাজ পৃথ্বিরাজের নিকট পরাজিত হন। (১১৯১ খ্রীঃ)। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরী জয়লাভ করেন (১১৯২ খ্রীঃ)। পৃথ্বিরাজ

*আক্রমণের উদ্দেশ্য*

বন্দী ও নিহত হন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ দিল্লী এবং উত্তর ভারতে তুর্ক-আফগান শাসনের ভিত্তি স্থাপন করে।




**দিল্লীর স্থলতানী শাসন**

মহম্মদ ঘুরী কুতুবউদ্দিন আইবক নামক সেনাপতিকে ভারতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং নিজে গজনী ফিরে যান। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু হয়। মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দিন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ভারতে গজনী ও ঘুরের প্রভাবমুক্ত মুসলিম শাসন প্রবর্তন করেন। ঘুর রাজ্যের অধিপতি গিয়াসউদ্দিন কর্তৃক

কুতুবউদ্দিন সুলতান উপাধিতে ভূষিত হন (১২০৮ খ্রীঃ)। শুরু হয় দিল্লীর সুলতানী শাসন।

তুর্ক-আফগান যুগে দাস রাজগোষ্ঠী, খলজী, তুঘলক, সৈয়দ এবং লোদী বংশের সুলতানগণ দিল্লীর সিংহাসনে তিন-শ বছরের কিছু বেশী কাল রাজত্ব করেন। তাঁদের শাসনকালে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ

রাজনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য ঃ সুলতানী শাসনকালে দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট দাস রাজগোষ্ঠীর তিনজন সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবক, ইলতুৎমিস এবং বলবন প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। ইলতুৎমিস সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তাঁর কন্যা রজিয়াকে দিল্লীর সিংহাসনে উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করেছিলেন। রজিয়া বিদুষী, বুদ্ধিমতী ও সাহসী মহিলা ছিলেন। কিন্তু রাজ্যের আমীর, মালিক ও মুসলিম উলেমাগণ একজন নারীর শাসন মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। তাদের চক্রান্তের ফলে শেষ পর্যন্ত রজিয়া সিংহাসনচ্যুত হন এবং তাঁকে প্রাণ দিতে হয়। ইলতুৎমিস তাঁর ক্রীতদাসদের মধ্য থেকে চল্লিশজন বিশ্বস্ত ও যোগ্য ক্রীতদাস নিয়ে একটি সংগঠন বা চক্র সৃষ্টি করেন। এই চক্র চাহাল-ই-বান্দাগান বা চল্লিশ বান্দার চক্র নামে পরিচিত ছিল। রজিয়ার পর চাহলে-ই-বান্দাগান দিল্লীর রাজনীতিতে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল। চল্লিশ বান্দাচক্রের কথামতই সেদিনের দিল্লীর সুলতানদের চলাফেরা করতে হত। সুলতান বলবন নির্মম হস্তে চল্লিশ বান্দাচক্রের ক্ষমতা নষ্ট করেন। তুর্ক-আফগান শাসনকালে আমীর, মালিক প্রভৃতি অভিজাতগণ উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিল। তারা সুলতানদের উপর প্রভাব বিস্তারেরও চেষ্টা করত। কিন্তু দিল্লীর অভিজাতদের রাজপদ ও ক্ষমতা ফ্রান্স অথবা ইংলণ্ডের অভিজাতদের মত বংশানুক্রমিক ছিল না।

সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য ঃ তুর্ক-আফগান সুলতান এবং আমীর মালিক প্রভৃতি অভিজাতগণ বহু ক্রীতদাস ক্রীতদাসী রাখত। বহুসংখ্যক ক্রীতদাস ক্রীতদাসী রাখা সামাজিক মর্যাদার

পরিচয় বহন করত। খলজীবংশের সুলতান আলাউদ্দিনের পঞ্চাশ হাজার ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী ছিল। তুঘলক বংশের সুলতান ফিরুজ তুঘলকের ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর সংখ্যা ছিল দু-লক্ষ। ভারত ছাড়া চীন, তুর্কীস্থান, পারস্য থেকে ক্রীতদাস আনা হত। ক্রীতদাসগণ নিজ গুণে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে পারত। সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। হিন্দু এবং মুসলমান মহিলাগণ পর্দাপ্রথা মেনে চলতেন। উচ্চ বংশের কোনো কোনো মহিলা শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা করলেও সাধারণ ঘরের রমণীরা ঘর-সংসারের কাজ নিয়েই সারা জীবন কাটাত। কয়েকটি শ্রেণীর মধ্যে সতীদাহ অর্থাৎ মৃত স্বামীর চিতায় স্ত্রীর প্রাণ বিসর্জনের প্রথা প্রচলিত ছিল। সুলতানের অনুমতি ছাড়া অভিজাত পরিবারের মধ্যে বিবাহ হতে পারত না।

**অর্থনৈতিক জীবনে বৈশিষ্ট্য:** তুর্ক আফগান সুলতানদের জনকল্যাণমূলক কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নীতি ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য কোনো কোনো সুলতান কিছু কিছু নীতি গ্রহণ করেছিলেন। দিল্লীর রাজকীয় কারখানায় এক সময় চার হাজার তন্তুবায় রেশম উৎপাদন করত। কিন্তু এই রেশম ছিল শুধু সুলতানী পরিবারের জন্য। জনসাধারণের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। তবে যুগ যুগ ধরে সরকারী সাহায্য ব্যতীতই ভারতে সুতী, রেশম ও পশম বস্ত্রশিল্প, ধাতুশিল্প, ইট ও পাথরের কাজ ইত্যাদি শিল্প গড়ে উঠেছিল। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে ছিল চিনি, কাগজ, অস্ত্র-নির্মাণ, জুতা তৈরী ইত্যাদি। বঙ্গদেশ বস্ত্র শিল্প, আদা, চিনি ও বিভিন্ন প্রকার শস্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। খলজী বংশের সুলতান আলাউদ্দিন খলজী বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য জিনিসপত্রের


আলাউদ্দিন খলজী

দাম বেঁধে দিয়েছিলেন। বাজার তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি শাহান-ই-মণ্ডী ( বাজার তত্ত্বাবধায়ক ) পদ সৃষ্টি করেন। অসাধু ব্যবসায়ীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। কোনো ব্যবসায়ী ওজন কম দিলে তার দেহ থেকে সমপরিমাণ মাংস কেটে নেওয়া হত। আলাউদ্দিনের মূল্য নিয়ন্ত্রণনীতির ফলে বাজারে পণ্যমূল্য কম ছিল। তুঘলক বংশের সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য কূপ নির্মাণ, খাদ্য বিতরণ, চাষের বীজ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছিলেন।



মহম্মদ বিন তুঘলক

কিন্তু তিনি গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলের অধিবাসীদের কর বৃদ্ধি করেন। কৃষকেরা কর-বৃদ্ধিতে বিব্রত ও অসন্তুষ্ট হয়। তারা বিদ্রোহ করে। মহম্মদ কঠোর হস্তে দোয়াবের বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। অর্থসমস্যা সমাধান এবং সোনারূপার অপব্যয় রোধের জন্য মহম্মদ তুঘলক তাম্রমুদ্রা প্রচলন করেন। কিন্তু তিনি মুদ্রা জাল রোধের কোনো ব্যবস্থা করেন নি। ফলে জাল তাম্র মুদ্রায় বাজার ভরে যায়। মহম্মদ মুদ্রাজালকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা না করে পুনরায় স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করেন।

হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক প্রভাব

দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতি পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অভিজাত মুসলিম রমণীগণ সতীদাহ ও জহরব্রতের মত হিন্দু অনুষ্ঠান গ্রহণ করেন। হিন্দুদের মধ্যে মুসলিম সন্তদের প্রতি এবং মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু সন্তদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত হয়। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই উপাস্য দেবতারূপে সত্যপীরের আবির্ভাব হয়। হিন্দুদের মধ্যে মুসলিম জ্ঞান সাধনা, চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে চর্চা আরম্ভ

হয়। মুসলমানদের মধ্যেও যোগ, বেদান্ত ইত্যাদি বিষয় জানার আগ্রহ দেখা দেয়। হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের প্রয়াসে উর্দুভাষা বিকাশ লাভ করে। উভয়ের প্রয়াসেই শিল্প, সঙ্গীত সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি হয়। মুসলমানগণ হিন্দু আখ্যান অবলম্বন করে কাহিনী রচনা করেন। হিন্দুগণ পারসিক ভাষায় ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা করেন। এই প্রসঙ্গে মালিক মহম্মদ জয়সিয়া কর্তৃক লিখিত পদ্মিনী আখ্যান এবং রাই ভান মলের পারসিক চর্চা উল্লেখযোগ্য। এই সময় প্রাদেশিক মুসলমান শাসনকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা থেকে প্রাদেশিক ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ করা হয়। গৌড়ের স্থলতান নসরৎ শাহের উৎসাহে মহাভারত বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা হয়। কৃত্তিবাস রামায়ণ অনুবাদ করেন। স্থলতান হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু ভাগবত বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। বস্তুতপক্ষে স্থলতানী যুগ প্রাদেশিক সাহিত্য বিকাশের যুগ।

শিল্প ও সংস্কৃতি—প্রাচীন ভাষা থেকে অনুবাদ

এই সময় কয়েকজন ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব হয়। ধর্মসংস্কারকগণ সহজ সরল ভাষায় ভক্তিবাদের উদার বাণী হিন্দু-মুসলমান সকলের মধ্যে প্রচার করেন। বহু হিন্দু-মুসলমান তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভক্তিবাদ ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নব ধর্ম আন্দোলনের কয়েকজন বিখ্যাত প্রবর্তক ছিলেন শ্রীচৈতন্য, নানক এবং কবীর। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হয়। চৈতন্যদেবের পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচীদেবী। জগন্নাথ মিশ্রের পূর্বপুরুষ শ্রীহট্টে বাস করত। জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করেন।

ভক্তিবাদ

চৈতন্যদেব কৃষ্ণনামের মধ্য দিয়ে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। মুসলমানগণও তাঁর ধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়েছিল। চৈতন্যদেবের শিষ্যদের মধ্যে হরিদাস বিখ্যাত। হরিদাস মুসলমান ছিলেন। যবন হরিদাস নামে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। হিন্দুসমাজে তখন নানা অনাচার দেখা দিয়েছিল

চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মে হিন্দুগণ, বিশেষতঃ হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। চৈতন্যদেবের ধর্ম হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র সকলের ধর্ম ছিল।

চৈতন্যদেব পুরীতে কিঞ্চিদধিক ৪৮ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। তাঁর পুণ্য জীবনী অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় জীবনী কাব্য লেখা আরম্ভ হয়। বাংলা সাহিত্যের এই নূতনত্ব চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরোক্ষ ফল।



শ্রীচৈতন্য

**নানক :** নানক ছিলেন ঐক্যের সাধক। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের প্রায় চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তালবন্দী গ্রামে নানক জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে নানক সংস্কৃত, আরবী এবং হিন্দী শিক্ষালাভ করেন। নানক গীতা, উপনিষদ, কোরাণ প্রভৃতি হিন্দু ও ইসলাম শাস্ত্র দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তিনি কবীরের ভক্তিবাদ দ্বারাও প্রভাবান্বিত হন। নানক ঈশ্বরলাভের পথ হিসাবে ভক্তিবাদ ও নামমার্গ প্রচার করেন। তিনি সমবেত প্রার্থনার উপরও গুরুত্ব দেন। কথিত আছে, নানক এবং তাঁর মুসলমান শিষ্য মরদানা তীর্থ পর্যটনকালে মক্কা ও বাগদাদ ভ্রমণ করেছিলেন।



নানক

নানক শিখধর্মের প্রবর্তক। বহু হিন্দু ও মুসলমান নানককে

গুরুপদে বরণ করেছিল। নানকের উপদেশাবলী "গ্রন্থসাহেব" (শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ) গ্রন্থে সংকলিত রয়েছে।

১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সত্তর বৎসর বয়সে নানক ইহলোক ত্যাগ করেন।

**কবীর:** কবীর চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কবীর আরবী শব্দ। কবীর অর্থ "মহান"।

মহাত্মা কবীরের জন্ম রহস্যাবৃত। কথিত আছে, জন্মের পর কবীরকে বারাণসীর একটি দীঘির ধারে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। নিরু নামে একজন মুসলমান জোলা এবং তাঁর স্ত্রী এই পরিত্যক্ত শিশুকে পালন করেন। কবীর হিন্দু ও ইসলামধর্মের আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ভজন ও "দোঁহার" মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান মিলনের বাণী প্রচার করেছেন। "দোঁহা" হল দুই পংক্তির কবিতা। কবীরের দোঁহা হিন্দী সাহিত্যের সম্পদ।



কবীর

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই কবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। কবীরের দেহত্যাগের পর তাঁর স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে হিন্দুগণ বারাণসীর কবীরচৌরা নামক স্থানে দাহ করে এবং মুসলমানগণ মগহরের দরগায় সমাধি দেয়।

**ইলিয়াসশাহ্ এবং হুসেন শাহের যুগে বঙ্গদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা:** বঙ্গদেশে তুর্ক-আফগান শাসন প্রায় প্রায় সাড়ে তিন-শ বছর স্থায়ী ছিল। এই শাসনকালের প্রধান দুটি বংশ হল ইলিয়াস শাহী বংশ এবং হুসেন শাহী বংশ।

মহম্মদ তুঘলক যখন দিল্লীর সুলতান তখন ইলিয়াস শাহ ছিলেন দিল্লীর আমীর। কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি দিল্লী থেকে পলায়ন করেন এবং বঙ্গদেশে এসে তিনি নিজেকে স্বাধীন সুলতানরূপে

ঘোষণা করেন। ইলিয়াস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইলিয়াস শাহী বংশ বঙ্গদেশে ১০৭ বৎসর রাজত্ব করেছিল। হুসেন শাহ্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হুসেনশাহী বংশ রাজত্ব করেছিল ৪৫ বৎসর।

ইলিয়াস শাহী এবং হুসেন শাহী যুগে বাংলার সমাজ আপন ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছিল। বহু হিন্দু উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। কৃষকগণ কৃষিকাজ করত, নবশাখ সম্প্রদায় শিল্পকর্মে নিযুক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ পূজা-পার্বণ করতেন। সমাজ-পতিগণ গ্রাম্য বিবাদ মীমাংসা করে দিতেন। সমাজে আমোদ-প্রমোদের জন্য সঙ্গীত, নৃত্য, যাত্রা, জাতুবিদ্যা, ক্রীড়া-কৌতুক, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদির প্রচলন ছিল।

এই যুগ বাঙালীর সাংস্কৃতিক বিকাশের যুগ। বঙ্গদেশের স্বাধীন সুলতানগণ সরকারীভাবে বঙ্গভাষায় পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁরা দিল্লীর সুলতানের মত ফারসী অথবা উর্দুভাষা বঙ্গদেশে প্রচলন করেন নি। ফলে বাংলা ভাষা হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের ভাষা-রূপে বিকাশ লাভ করেছে। ইলিয়াস শাহী এবং হুসেন শাহী যুগে চণ্ডীদাস, মালাধর বসু, কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত, রঘুনাথ পণ্ডিত কৃষ্ণ-কমল গোস্বামী, জ্ঞানদাস এবং মুসলমান কবিদের মধ্যে উদ্ধরণ শেখ আবদুল গফুর, আরীফ প্রমুখ সাহিত্যিকদের আবির্ভাব হয়। চৈতন্যদেব ছিলেন হুসেন শাহের সমসাময়িক। চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বন করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করেন। বিখ্যাত মনসামঙ্গল কাব্যও এই যুগে রচিত হয়। ইলিয়াস শাহী যুগে মালদহ জেলায় বিখ্যাত লোটন মসজিদ নির্মিত হয়। হুসেনশাহ্ এবং তাঁর পুত্র নসরৎশাহ্ মালদহের বড় সোনা মসজিদটি নির্মাণ করেন।

মরক্কো দেশীয় পর্যটক ইবন বতুতা ইলিয়াস শাহী যুগে বঙ্গদেশ ভ্রমণ করেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে স্বল্পমূল্যে প্রচুর জিনিস পাওয়া যেত। একটি দুগ্ধবতী গরুর দাম ছিল তিন টাকা পনের গজ সূক্ষ্মবস্ত্রের দাম দু'টাকা, একটি ভেড়ার দাম চার আনা বা বর্তমান পঁচিশ পয়সা। মাসুদী নামে একজন বিদেশী তখন

বঙ্গদেশে থাকতেন। তিনি ইবনবতুতাকে বলেছিলেন যে, সাত টাকায় তাঁর তিনজন লোকের সংসারের সারা বছরের খাওয়া হয়ে যায়। অন্যান্য সূত্র থেকেও তখনকার দিনে বঙ্গদেশের সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোক ছিল কৃষিজীবী। এদেশে প্রচুর পরিমাণে ধান, গম, যব, আম, কলা, কাঁঠাল, ইক্ষু, নারকেল জন্মাত। পণ্য ক্রয়ের জন্য টাকা এবং কড়ি উভয়েরই প্রচলন ছিল। বঙ্গদেশের সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র এবং রেশমবস্ত্র ছিল বিখ্যাত।

**শাসনব্যবস্থা ঃ** তুর্ক-আফগান যুগের শাসন-ব্যবস্থায় সুলতান ছিলেন সর্বেসর্বা। তাঁর কথাই ছিল আইন। সুলতানের ইচ্ছাকে বাধা দেওয়ার মত ক্ষমতা কারুর ছিল না। তবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য দিল্লীর সুলতানগণ মজলিস-ই-খলওয়ত-এর পরামর্শ নিতেন। সুলতানের বন্ধুবান্ধব এবং বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীদের নিয়ে মজলিস-ই-খলওয়ত গঠিত হত। সুলতান ছিলেন প্রধান বিচারপতি। রাজ্যের সর্বোচ্চ পদটির নাম উজীর। উজীর বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনা করতেন। এই বিভাগগুলি সামরিক বিভাগ, যোগাযোগ বিভাগ, ক্রীতদাস বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, টাঁকশাল, কারখানা ইত্যাদি। অন্যান্য পদস্থ রাজকর্মচারীদের মধ্যে খাজিন ছিলেন কোষাধ্যক্ষ, মুস্তৌফি ই-মমালিক রাজ্যের খরচের উপর দৃষ্টি রাখতেন, মজুমদার ঋণ সংক্রান্ত দলিলপত্র রক্ষা করতেন। সেনাবাহিনীর বেতনের দায়িত্ব ছিল বক্সী-ই-ফৌজ-এর উপর। নৌবাহিনীর অধ্যক্ষকে বলা হত আমীর-ই-বহর।

দিল্লীর সুলতানগণ প্রাদেশিক শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাজপ্রতিনিধি নিয়োগ করতেন। তাঁদের নায়েব-সুলতান বলা হত। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রদেশগুলি আমিল এবং সিকদারে বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসন পরিচালনায় নায়েব সুলতানগণ ছিলেন সর্বেসর্বা। নায়েব সুলতানগণ দিল্লীতে রাজস্ব পাঠিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত রাজত্ব করতেন। নায়েব সুলতানদের নিজস্ব সেনাদল ছিল। দিল্লীর সুলতানের প্রয়োজনের সময় সেনাবাহিনীর সুলতানের সাহায্যে অগ্রসর হওয়ার নিয়ম ছিল। এই বিষয়ে

নায়েব সুলতানের অবস্থা ছিল অনেকটা মধ্যযুগের ইউরোপের ব্যারনদের মত। নায়েব সুলতানগণ সুযোগ পেলেই দিল্লীর প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন।

তুর্ক-আফগান শাসনের অবসান

তুর্ক-আফগান শাসনকালের শেষ বংশ লোদীবংশ? এই বংশের তিনজন সুলতান বাহলুল লোদী, সেকান্দার লোদী এবং ইব্রাহিম লোদী ৭৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ইব্রাহিম লোদীর শাসনকালে সুলতান এবং আমীরদের মধ্যে সম্পর্ক এমন তিক্ত হয় যে, পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী বাবরকে ভারত আক্রমণ এবং ইব্রাহিম লোদীকে উচ্ছেদ করার অনুরোধ করেন। বাবর তখন কাবুলের আমীর। ভারতের উপর তাঁর লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। বাবর সুযোগ বুঝে ভারত আক্রমণ করেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী বাবরের নিকট পরাজিত ও নিহত হন।

বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।

## অনুশীলনী (১)

**মৌখিক প্রশ্ন :** (১) সুলতান মামুদ কতবার ভারত আক্রমণ করেন? (২) তুর্ক-আফগান সুলতানগণ কত বৎসর রাজত্ব করেছিলেন? (৩) কে কুতুবউদ্দিনকে সুলতান উপাধিতে ভূষিত করেন? (৪) ঘুর কোথায় অবস্থিত?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন :** (১) তুর্ক-আফগান নামকরণের কারণ কি? (২) ভারতে তুর্ক-আফগান আক্রমণের উদ্দেশ্য আলোচনা কর। (৩) কিভাবে দিল্লীতে সুলতানী শাসন আরম্ভ হয়?

**রচনাধর্মী প্রশ্ন :** তুর্ক-আফগান শাসনকালে ভারতে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

## অনুশীলনী (২)

**বিষয়মুখী প্রশ্ন :** (১) কত খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন? (২) শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কে? (৩) "দোঁহা" কি?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) তুর্ক-আফগান যুগে হিন্দু মুসলমান পারস্পরিক প্রভাব আলোচনা কর। (২) **ধর্মসংস্কারকগণের অবদান আলোচনা কর ঃ** (ক) শ্রীচৈতন্য; (খ) নানক; (গ) কবীর।

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** তুর্ক-আফগান শাসনকালে শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ এবং ভক্তিবাদ আন্দোলনের পরিচয় দাও।

## অনুশীলনী (৩)

**মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (১) তুর্ক-আফগান শাসনব্যবস্থায় কোষাধ্যক্ষকে কি বলা হত? (২) ইবনবতুতা কে? (৩) কত খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়?

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন ঃ** (১) তুর্ক-আফগান শাসন-ব্যবস্থা আলোচনা কর। (২) কিভাবে তুর্ক-আফগান শাসনের অবসান হয়?

**রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** ইলিয়াস শাহ্ এবং হুসেন শাহের যুগে বঙ্গদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

| চতুর্দশ অধ্যায় | মধ্যযুগের অবসান কাল<br>( চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী ) |
|---|---|

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কগণ বাইজানটাইম-এর রাজধানী কনস্টান্টিনোপল অধিকার করে। তুর্কদের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে প্রাণরক্ষার জন্য বাইজানটাইম-এর অধিবাসিগণ ইতালীতে আশ্রয় নেয়। শরণার্থীদের মধ্যে বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা বাইজানটিয়াম থেকে ইতালীতে আসার সময় প্রাচীন গ্রীক পুঁথি ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক নিদর্শন সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

ইতালী এইসব প্রাচীন গ্রীক জ্ঞানচর্চা এবং সাংস্কৃতিক নিদর্শনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে চমকিত হল। বিস্তৃত প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে ইতালীর মাধ্যমে নূতন করে পরিচয় লাভ করে ইউরোপের নবজন্ম হল। নবজন্মকে বলা হয় রেনেসাঁস। রেনেসাঁস ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান কাল সূচনা করেছিল।

বাইজানটিয়াম হতে আগত শরণার্থী পণ্ডিত সমাজের কাছ থেকে গ্রীক জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান লাভ করার পর ইতালীতে প্রাচীন গ্রীক-চর্চার জোয়ার এল। বড় বড় গ্রন্থাগার স্থাপিত হল। এইসব গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রীক পুঁথিগুলি সংরক্ষণ করা হল। ইতালীর শহরগুলিতে প্রাচীন গ্রীক পদ্ধতি অনুসরণ করে শিল্প ও স্থাপত্য বিকাশ লাভ করে।

অবশ্য দান্তে, বোকাসিও, পেত্রার্ক প্রমুখ ইতালীয় সাহিত্যিকদের আবির্ভাবের ফলে ইতালীতে চতুর্দশ শতাব্দীতেই রেনেসাঁস-এর লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। মধ্যযুগের ইউরোপীয় চিন্তা ছিল একান্তভাবে ঈশ্বর এবং চার্চ-এর উপর নির্ভরশীল। চার্চ-এর অনুশাসন বৈজ্ঞানিক সত্য জানার অন্তরায় ছিল। মধ্যযুগের শিল্প-সাহিত্য ঈশ্বর, পোপ আর চার্চকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল। রেনেসাঁস এই অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের উপরই আঘাত হানে। রেনেসাঁস ঈশ্বর এবং পোপ-এর পরিবর্তে সাধারণ মানুষের মহিমা ঘোষণা করে। সেজন্যে রেনেসাঁস মানবতাবাদ নামেও পরিচিত।

দান্তে ( ১২৬৫-১৩২১ খ্রীঃ ) তাঁর "ডিভাইন কমেডি" কাব্যগ্রন্থে স্বর্গ-মর্ত্য যাত্রার কাল্পনিক কাহিনীর পটভূমিতে মধ্যযুগের সমাজের সমালোচনা করেন। বোকাসিও ( ১৩১৩-৭৫ খ্রীঃ ) ডেকামেরন" গ্রন্থ একশটি ছোট গল্প সংকলন করেন। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ অবলম্বন করে গল্পগুলি লেখা হয়েছিল। পেত্রার্ক ( ১৩০৪-১৩৭৪ খ্রীঃ ) মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠাতারূপে অভিহিত হন।

দান্তে, বোকাসিও এবং পেত্রার্ক তাঁদের রচনায় যে নবযুগের আভাস দিলেন লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চি, মিকেলানজেলো এবং র‍্যাফেল-এর সৃজনশীলতায় তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। এঁরা তিনজনেই ছিলেন ইতালীর অধিবাসী। রেনেসাঁস যুগের এই তিনজন মনীষী বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ( ১৪৫২-১৫১৯ খ্রীঃ ) ছিলেন চিত্রকর, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, স্থপতি, ভাস্কর, সঙ্গীতশিল্পী এবং কবি। দা ভিঞ্চি পথে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের ছবি এঁকেছেন। তাঁর বিখ্যাত চিত্র "মোনা লিসা" চিরকালের বিস্ময়কর সৃষ্টি। মিকেলানজেলো ( ১৪৭৫-১৫৬৪ খ্রীঃ ) ছিলেন ভাস্কর, স্থপতি, শিল্পী, সামরিক ইঞ্জিনিয়ার এবং কবি। তাঁর শিল্প সৃষ্টিতে মানুষের শক্তি ও শৌর্য প্রকাশিত হয়েছে। র‍্যাফেল ( ১৪৮৩-১৫২০ খ্রীঃ ) ছিলেন চিত্রকর। র‍্যাফেল মাতা-মেরীর-ক্রোড়ে যীশু বিষয়টি অবলম্বন করে যে কয়েকটি বিখ্যাত "ম্যাডোনা" চিত্র আঁকলেন তা কোন স্বর্গীয় মাতা-পুত্র নয়—র‍্যাফেল-এর "ম্যাডোনায়" পৃথিবীর মাটির সাধারণ মাতৃহৃদয়ের আবেগ, আনন্দ ও গর্ব রূপ নিয়েছিল। ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে রেনেসাঁস-এর শিল্পীগণ মানুষের আবেগ, বেদনা, সংগ্রামকে সত্য রূপ দিতে চেয়েছিলেন। সাহিত্যিকগণ পণ্ডিত সমাজের ল্যাটিন ভাষা বর্জন করে সাধারণ মানুষের প্রাণের ভাষা ইতালীয় ভাষাতে সাহিত্য রচনা করেছিলেন।

ইতালী থেকে রেনেসাঁস আন্দোলন ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

শুধু সাহিত্য ও শিল্প নয়, ইউরোপে রেনেসাঁস আন্দোলন নানা

বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। এই বৈশিষ্ট্য ছিল জ্ঞানান্বেষণ, যুক্তিবাদ, জ্ঞানের দিগন্ত বিস্তার, অস্পষ্ট তথ্য অস্বীকার করে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং ভৌগোলিক আবিষ্কার। চার্চ-এর বিরোধিতা ও নির্যাতন সত্ত্বেও কোপার্নিকাস, ব্রুনো এবং গ্যালিলিও তাঁদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দ্বারা বিশ্ব ও প্রকৃতির সত্য উদ্ঘাটন করলেন। জলের চাকা, ধাতুবিদ্যা ও অন্যান্য কারিগরি বিদ্যার উন্নতির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেল। কম্পাস, জাহাজ নির্মাণ ও সমুদ্রযাত্রার বিভিন্ন উপকরণের উন্নতির ফলে সমুদ্রযাত্রা নিরাপদ হল। স্পেন এবং পর্তুগাল সমুদ্র অতিক্রম করে ভৌগোলিক আবিষ্কারের নেতৃত্ব নিয়েছিল। স্পেনের সহযোগিতায় কলম্বাস আমেরিকা যাত্রাপথ আবিষ্কার করলেন। পর্তুগালের সহযোগিতায় ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকা ঘুরে ভারতে আগমন পথ আবিষ্কার করেছিলেন। এইসব যাত্রাপথ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ইউরোপ পরবর্তীকালে আমেরিকা, আফ্রিকা এবং ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করে। উপনিবেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে ইউরোপের পুঁজিপতি শ্রেণী সমৃদ্ধ হয়। জার্মানিতে গুটেনবার্গ মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। এই আবিষ্কারের ফলে পুস্তক ছাপা সহজ হয় এবং বহু লোক মুদ্রিত পুস্তক পাঠ করার সুযোগ লাভ করে। সমাজে জ্ঞানের প্রসার হয়।

মধ্যযুগে সামন্তপ্রভুগণ তাদের ছোট ছোট এলাকা বা জমিদারিগুলিতে কার্যতঃ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করত। রেনেসাঁস যুগে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, পর্তুগাল এবং স্পেনে জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকটি জাতীয় রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট সীমানা ছিল এবং এই সীমানার মধ্যে একমাত্র রাজার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টির ফলে জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হতে থাকে। হল্যাণ্ডের জনগণ স্পেনের শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করে। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইউরোপের পাঁচটি দেশ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল এবং হল্যাণ্ড, এশিয়া, আফ্রিকা

এবং আমেরিকায় উপনিবেশ ও বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছিল। উপনিবেশ ও বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে প্রচুর লাভের ফলে এই দেশগুলিতে পুঁজি সঞ্চিত হচ্ছিল। এইসব দেশের পুঁজিপতি শ্রেণী, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, কারখানার মালিক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ নিজেদের অজ্ঞাতসারেই একটি নূতন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করছিল—সে সমাজ ব্যবস্থা পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধী।

প্রায় সব কটি ঔপনিবেশিক দেশেই পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নূতন সমাজ ব্যবস্থার সংঘর্ষ আরম্ভ হয়েছিল। ইংলণ্ডের মাটিতে এই সংঘর্ষের চেহারা ও চরিত্র স্পষ্টতর হল। রবার্ট কেট-এর নেতৃত্বে ইংলণ্ডের কৃষক সম্প্রদায় জমির দাবিতে রাজা এবং সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করে (১৫-৯ খ্রীঃ)। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ওলিভার ক্রমওয়েল-এর নেতৃত্বে ইংলণ্ডের নবজাত ব্যবসায়ী-মালিক-পুঁজিপতি-মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজা প্রথম চার্লস-এর স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টের অধিকার রক্ষার জন্য বিপ্লব করে। বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে রাজশক্তির পতন হয়, চালস-এর শিরশ্ছেদ করা হয়। পার্লামেণ্টের অধিকার স্বীকৃত হয়। পার্লামেণ্ট গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতীক। পরে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলেও আজও সে দেশে পার্লামেণ্ট সর্বপ্রধান শক্তি।

মানবতাবাদের জয় ঘোষণা, জ্ঞানবিজ্ঞান সাধনা, বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক আবিষ্কার, সামন্তশ্রেণীর পতন, নূতন শ্রেণীর উত্থান ও স্বৈরাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের অবসানকাল চিহ্নিত হয়।

## অনুশীলনী

**সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরনের প্রশ্ন :** (১) রেনেসাঁস-এর কারণ কি (২) দান্তে, বোকাসিও এবং পেত্রার্ক বিখ্যাত কেন? (৩) রেনেসাঁস আন্দোলনে লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চি, মিকেলানজেলো এবং রাফেল-এর ভূমিকা আলোচনা কর।

**রচনাধর্মী প্রশ্ন :** ইউরোপে রেনেসাঁস আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। ইংলণ্ডে বিপ্লবের কারণ কি?

---